শিক্ষায় বিজ্ঞান দর্শন

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

শিক্ষা বিজ্ঞান দর্শন

শিক্ষা বিজ্ঞান দর্শন

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

"বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বি. সি. আই. সি.-র খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত।"

মুক্তধারা ১৩৫৫

প্রকাশক
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা ১১০০ বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৫
দ্বিতীয় প্রকাশ জুন ১৯৮৮
প্রচ্ছদ-শিল্পী রফিকুননবী

মুদ্রাকর
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
ঢাকা ১১০০
৭৪ ফরাশগঞ্জ বাংলাদেশ

মূল্য সাদা কাগজ ৪৫·০০ টাকা
লেখক কাগজ ৩৩·০০ টাকা

SHIKKHA BIGGAN DARSHAN
[Essays on Education, Science & Philosophy]
By Muhammad Ibrahim
Second Edition June 1988
Cover Design Rafiqun Nabj
Publisher C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj
Dhaka 1100 Bangladesh

Price Whiteprint Taka 45.00
Lekhakprint Taka 33.00

এই বইয়ের যদি কোন মূল সুর থেকে থাকে তবে তা হলো আমাদের চিত্তভূমিকে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণায় সুফলা করার এবং কর্মপথে তাকে পাথেয় হিসাবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এর বাস্তবায়ন যাতে হতে পারে আমাদের সৃষ্টিশীলতায়, নিজের ভাষায় এবং সর্বসাধারণের অংশ গ্রহণে তারই আলোচনা এখানে মুখ্য। যে বন্ধুর উৎসাহ একান্ত অনুপ্রেরণাদায়ী এ বই তার হাতে দিলাম।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচীপত্র

বাংলাদেশ ও গণমুখী বিজ্ঞান	৯
সাধারণ শিক্ষায় বিজ্ঞান	১৭
স্কুলের পদার্থবিদ্যায় শিক্ষা উপকরণ	২৬
ব্রিটেনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও আমরা	৩০
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নীতি	৪০
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা	৫২
বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষায় বাংলা মাধ্যম	৮৫
ব্রিটিশ এসোসিয়েশন সম্মেলন : শতাব্দীখ্যাত বিজ্ঞান উৎসব	৯৪
নোবেল উৎসব ১৯৭৭	৯৮
দর্শনের বৈজ্ঞানিক পটভূমি	১০৫
বিজ্ঞানে বিশ্বাস করা কেন অথবা দর্শনে আরোহ সমস্যা	১২৬

বাংলাদেশ ও গণমুখী বিজ্ঞান

স্বাধীনতার মুহূর্তটিকে যদি আমরা দেশের সার্বিক প্রগতির জন্য একটি বৈপ্লবিক মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই, তা হলে খুব বড় একটি পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চেতনার ক্ষেত্রে। পুরোনো ব্যবস্থার কোন রকম চুনকামই এই ক্ষেত্রে আমাদের ভয়ানক শূন্যতাকে ঢাকতে অক্ষম। আর সত্যি সত্যি যদি কিছু করতে হয়, তবে এই-ই তার সময়।

আমাদের দেশ বিজ্ঞানের উর্বর ক্ষেত্র কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর। বিশ্বখ্যাত কয়জন বিজ্ঞানী এদেশ থেকে বেরিয়েছেন, প্রতি বছর বিজ্ঞান গ্রাজুয়েটের সংখ্যা কি হারে বাড়ছে বা বিশ্বের বিজ্ঞান জার্ণালগুলোতে বাঙালী বিজ্ঞানীদের কয়টি মৌলিক অবদান স্থান পাচ্ছে, এর কোনটাকেই সামগ্রিক উর্বরতার মাপকাঠি হিসেবে নেয়া চলে না। বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার এক বিজ্ঞান শিক্ষক বন্ধুর লেখা থেকে একটু তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। তিনি লিখেছেন: "ইংরেজ আমলে শিক্ষার সৌখিন অনুষঙ্গ হিসেবে যে বিজ্ঞান এদেশে আমদানি হয়েছিল, আজও সে বিজ্ঞান বিদ্যায়তন ও গবেষণাগারের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গণ্ডিতে লালিত। এদেশের উন্মুক্ত জল-হাওয়ায় সে মুক্তি পায়নি, তার অভিযোজনও তাই অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞানের আশ্বাস এদেশে আজও মরূদ্যানের সবুজের মতই সীমিত, সকীর্ণ ও ব্যাপক ঊষরতার বেষ্টনীতে ত্রস্ত।" এমনই একটা মরূদ্যানের সমস্ত অপ্রাসঙ্গিকতাকে তুচ্ছ করে কিছু ভাগ্যবান বিজ্ঞানের সফল ছাত্র হতে পারে বটে, কিন্তু আশে পাশের মরুভূমির পক্ষে তাতে বড় একটা কিছু আসে যায় না। এ অবস্থায় প্রাসঙ্গিকতার খোঁজে হয় সেই ছাত্র দেশের মায়া কাটায় অথবা নিজেকে একটা হতাশ গতানুগতিকতার মধ্যে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

একটু কাছে এসে দেখলে দেখব সমস্যাটি আমাদের সমাজের আর দশটা সমস্যার সাথে সম্পর্কহীন নয়, বরং মূলত সমস্যা একই। এ সমাজের সব কিছুর মত আমাদের বিজ্ঞান জগৎটাও অবিশ্বাস্য রকমের মাথাভারী। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ যে বহু কোটি জনতার হয়নি তাদেরকে প্রথমেই বাদ দিয়ে রাখতে হয়; কারণ শুধু বিজ্ঞান কেন, অক্ষর, কৃষ্টি বা শিক্ষার অন্য কোন আশীর্বাদই তাদের উপর বর্ষিত হয় না। যারা স্কুলে ঢুকল অতি অল্প বয়সে তাদের শতকরা সত্তর-আশীভাগকে জানিয়ে দেয়া হল যে, যেহেতু তারা অঙ্কে আশানুরূপ ভাল করেনি বা যেহেতু ঐ স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়নি, সেহেতু পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞানের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক না রাখলেও চলবে। বাকিদের মধ্যে যারা ভাল ছাত্র হয়ে স্কুল কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগুলো শীগ-গীর তারা জানলো যে পদার্থবিদ্যা মানেই হচ্ছে পরমাণু রহস্যের সমাধান করা বা জীববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রোটিনের আণবিক গঠনের উদঘাটনটাই আসল কাজ। স্বভাবতই এ পরিস্থিতিতে বেশীর ভাগের পক্ষে বিজ্ঞান ডিগ্রীটা হস্তগত করে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়াই কাম্য হয়, যে জীবনে বিজ্ঞান জিনিসটা নেহাত অপ্রাসঙ্গিক। আর বাকী মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবানের জন্য এবং আন্তর্জাতিক দরবারে দেশের 'সুনামের' খাতিরে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগার, আণবিকশক্তি কেন্দ্র ইত্যাদি কয়েকটা সুদর্শন বিজ্ঞান-মন্দিরে কিছু উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা হয়েছে। এ যেন সত্যিকার চোর ধরা দেখে বাচ্চাদের চোর চোর খেলার মত আমরাও এক নিষ্ঠুর বিজ্ঞান-বিজ্ঞান খেলায় ব্যস্ত আছি।

অথচ বিজ্ঞান মানে কি তাই? বৈজ্ঞানিক জগতে বাস করার মানে সার্বিক ও সর্বজনীন চিন্তার বিপ্লব ও কারিগরি বিপ্লব। বিজ্ঞানের বিশ্ব-সীমারেখা যেখানে জানা ও অজানার যুদ্ধটা চলছে সেটা এই বিপ্লবেরই ফলশ্রুতি. এর সাথে সম্পর্কবিহীন কোন ঘটনা নয়। আজকের উন্নত দেশগুলো এ পথেই এগিয়েছে। কাজেই তারা দাবি করতে পারে এ বিজ্ঞান আমাদের বিজ্ঞান ও আমাদের জন্যে বিজ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইংল্যাণ্ডের শিল্প. বিপ্লবে মাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের যতখানি অবদান, মাঞ্চেষ্টারের কামার আর কারিগরদের অবদান তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। এর কারণ, বিজ্ঞান-চেতনা ও শিল্প-বিপ্লব সমগ্র সমাজকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে। তাই এখানে বাগানের মালী আর গবেষণাগারের উদ্ভিদবিদের মধ্যে তফাতটা আপেক্ষিক, মৌলিক নয়। দু'জনেরই চেতনাটা ও উৎসাহটা মূলত বৈজ্ঞানিক। দু'জনের পক্ষেই বিজ্ঞানের আশীর্বাদে সিক্ত হবার প্রবৃত্তি ও সুযোগ রয়েছে।

আমাদের দেশেও বিজ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত গবেষণাগার ও বিদ্যায়তনের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে বাড়িতে, ক্ষেতে, খামারে, কারখানায় ছড়িয়ে পড়তে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ'টি আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে না। এ পর্যন্ত সত্য অনুসন্ধানের বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টায় দু'একজন স্বদেশবাসী প্রতিভাবানের অংশগ্রহণকেই আমরা দেশের বিজ্ঞান প্রচেষ্টা বলে চালিয়েছি। অথচ সত্য অনুসন্ধানের মত সত্য প্রতিষ্ঠাও বিজ্ঞানের একটি বড় কাজ। এতদিন আমরা এ কাজটির কাছে ধারেও যাইনি। ফলে মানুষের জয়যাত্রায় আমরা পিছিয়ে গিয়েছি সাংঘাতিকভাবে। এ অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে একমাত্র বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। পরিবর্তনটা আনতে হবে দু দিক থেকে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে আর দেশের যে সংখ্যাতীত জনতা স্কুল-কলেজের সুযোগ পায়নি, দ্রুত ব্যাপক ও সত্যিকার গণশিক্ষার মাধ্যমে তাদের জীবিকা ও জীবনের চেহারা বদলিয়ে। দু'টি বিষয়েই সম্ভাব্য কয়েকটি ব্যবস্থা সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে, দেশের প্রত্যেকটি ছেলে ও মেয়ে শহর, গ্রাম, পরিবার বা শ্রেণী নির্বিশেষে বিনা খরচে একটা স্কুলে গিয়ে সাত আটটি বছর (অন্তত চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত) যেন সেখানে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করা। এরা মেধাবী হোক বা না হোক পরবর্তী জীবনে যে যাই করুক, এদের কাছ থেকে কোন রকম উৎপাদনমূলক শ্রম যেন পরিবার বা জাতির আশা করতে না হয়। যেহেতু এদের উপর ভিত্তি করে পুরো জাতি গড়ে উঠবে, সুতরাং এরাই পাবে সবচেয়ে

বেশী যত্ন ও দৃষ্টি আর দেশের সার্বিক বিজ্ঞান চেতনার ভিত্তিও হবে এরাই। সবচেয়ে বড় কথা, এদের শিক্ষাকে শুধু ভবিষ্যতে উচ্চতর শিক্ষার যাচাই ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করলে চলবেনা। বরং এর মধ্যেই এমন একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা থাকবে, যা পরবর্তী জীবনে ছাত্ররা উচ্চতর একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ করুক বা না করুক উভয় ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে। এদের আগা-গোড়া শিক্ষায় বিজ্ঞান চেতনা খুব বড় স্থান পাবে।

এই পর্যায়ের ছাত্রদের সবার বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি আছে কিনা বা প্রত্যেক স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার মত প্রয়োজনীয় অর্থ আছে কিনা, এ দুটা প্রশ্নই অবান্তর। প্রথমত মনোবৃত্তির প্রশ্ন আসে বিশেষজ্ঞ তৈরির বেলায়। প্রগতিশীল যে কোন বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রত্যেক সদস্যেরই বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত স্কুল পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশ হাজার টাকা খরচে বহু কাচের-আল-মারী ভর্তি Griffin & George-এর তৈরি যন্ত্রপাতি সাজানো অত্যাবশ্যক নয় মোটেই। এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির আরো একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

বিজ্ঞান শিক্ষাকে খুব সহজেই "জীবন ও প্রকৃতির দিকে তাকাও" ও "নিজে করার চেষ্টা করো" এই ভিত্তিতে নেয়া সম্ভব। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রকৃতিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার জন্য তো আমাদের গ্রামীণ পরিবেশের চেয়ে উপযুক্ততর কোন পরিবেশ কল্পনা করা যায় না। তারপর ধরা যাক পদার্থবিদ্যার কথা। পদার্থবিদ্যার মূল বিষয়-গুলো খুব সাধারণ, সব টুকিটাকি ও খুবই অল্প খরচে জিনিসপত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্ভব। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, হচ্ছে, "নিজে করার চেষ্টা করো।" শুধু এর মাধ্যমেই বিজ্ঞান শিক্ষাকে ছাত্রের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তোলা যেতে পারে। নিত্যকার শিক্ষার জন্য সেটা খুবই প্রয়োজনীয়। ফলত বিজ্ঞানের যে সব সকল ছাত্র বিদেশে উচ্চতর গবেষণা করতে যায়, বিদেশী গবেষণাগারে ঢুকে প্রথম যে জিনিসটা তাদের ঘাবড়িয়ে দেয় তা হলো; যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক বস্তু তাদের নিজের হাতে তৈরি করতে হয়। ওয়ার্কশপ বস্তুটার

সাথে আমাদের পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্রের সাক্ষাৎ ঘটেনা। সব পর্যায়েই ওটা তারা কামার ছুতোরের এলাকা মনে করে আসছে। আমরা ভুলে গিয়েছি যে এক টুকরা ধাতু, এক টুকরা কাঠ বা একখণ্ড কাচকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসে রূপ দেয়াটা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। একথাটা মনে রেখে আমাদের প্রত্যেকটা স্কুলের ভেতর যেন একটা ক্ষুদে কামার, ছুতোর glass-blower ও ইলেকট্রিশিয়ানের ওয়ার্কশপ গড়ে উঠে যেখানে ছাত্ররা বিজ্ঞানের মাধ্যমে পদার্থ ও প্রকৃতির সাথে নিজের প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তখন দেখা যাবে যে শুধু ছুরি, কাঁচি, সুতো, বল, চাকা, বেলুন, ড্রাইসেল, তার ইত্যাদি দিয়ে পদার্থবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার বহু রহস্য অর্থপূর্ণ করে তোলা যাচ্ছে নিজের হাতে হাতেই। এই প্রসঙ্গে একটা জিনিসের কথা মনে পড়ল। ব্রিটেনের বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের জন্ম দিনে অথবা ক্রীস্টমাসে উপহার দেবার জন্ম খুব অল্প খরচে একটা জিনিস পাওয়া যায়, নাম chemistry set। এর মধ্যে থাকে ছোট ছোট কয়েকটা কাচের নল, টেস্ট টিউব ও ফ্লাস্ক যেগুলো যে কোন হাতুড়ে glass blower তৈরি করতে পারে যে কোন জায়গায়। আর থাকে লেবুর রস, সিরকা, লবণ ইত্যাদি জাতীয় খুবই নিরাপদ ও সাধারণ কয়টা জিনিস। নিজের কৌতূহল ও সাথের বইটাকে ভিত্তি করে যে কোন বাচ্চার কাছে এর মাধ্যমে রসায়ন বিদ্যাটা খুবই অর্থপূর্ণ ও চমকপ্রদ হয়ে উঠতে পারে। এরপরও হয়তো আমাদের স্কুলে কিছু তৈরি যন্ত্রপাতি দরকার হবে, যেগুলো আমাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে খেয়াল রেখে দেশীয় সম্পদের ভিত্তিতে তৈরি করলে খরচের বোঝাটা মোটেই ভয়াবহ হয়ে উঠবে না।

এই স্কুল থেকে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে ছেলে মেয়েরা পরবর্তী জীবনের মোকাবেলা করবে। যারা আরো একাডেমিক শিক্ষার জন্ম মনোবৃত্তি ও মেধার পরিচয় দেবে, তারা উচ্চতর স্কুল হয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দিকে এগুবে। এখানেও প্রত্যেক পর্যায়ে দৃষ্টিভঙ্গীটা হবে একই—গণমুখী ও দেশের প্রয়োজনের সাথে গাঁথা। তবে স্বাভাবিকভাবেই

এরপর থেকে specialization ইত্যাদির প্রশ্ন উঠবে। বাকি যারা উচ্চতর একাডেমিক শিক্ষা নেবেনা, তাদের জন্যও কিন্তু শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা এখানেই শেষ হবে না। তারাও নিজেদের পছন্দ ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষা নিতে থাকবে প্রয়োজন হলে উৎপাদনমূলক পেশা চালিয়ে যাবার সাথে সাথে। এদের জন্য শুধু শহরে নয়, দেশের সর্বত্র ছোট বড় বহু দিবা ও নৈশ পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, প্রয়োজন মত কৃষি খামার, কল কারখানা বা প্রজেক্টের পাশাপাশি। এখান থেকে মানুষ পাবে উন্নততর চাষী, শ্রমিক, কারিগর, ইলেকট্রিশিয়ান, কর্মচারী, সেক্রেটারী, একাউনটেন্ট হবার ও সর্বোপরি উন্নততর মানুষ হবার শিক্ষা, জীবনকে ও জীবিকাকে সত্যিকার অর্থে উপভোগ করার উৎসাহ। এ রকম একটা সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক থেকে যারা বেরুবে তাদের মধ্যে বাগানের মালী ও গবেষণাগারের উদ্ভিদবিদের তফাতটা হবে আপেক্ষিক, মৌলিক নয়। উভয়ের চেতনাটা ও উৎসাহটা জীবিকা নির্বাহের সাধারণ প্রয়োজনকে অতিক্রম করে হবে বৈজ্ঞানিক।

এবার আসতে হয় দ্বিতীয় বিষয়টার অর্থাৎ গণশিক্ষার আলোচনায়। প্রথমোক্ত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নিতে দেশের সংখ্যাতীত নিরক্ষর জনতার জন্য দেরি হয়ে গিয়েছে। অথচ তাঁদেরকে হিসেবের মধ্যে না ধরলে সার্বিক পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই উঠে না। স্বাধীনতা-উত্তর বৈপ্লবিক পরিবেশে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশকে পূর্ণ শিক্ষিতের দেশে পরিণত করার একটা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। এখন গণশিক্ষা বলতে যদি আগের মত একখানা সরকারি শিক্ষা অফিস ও সরকারী চক্‌চকে ম্যাগাজিনে কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষার ছবির সংযোজন মনে করা হয়, তা হলে বলার কিছু নেই। কিন্তু সত্যি যদি সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরিকল্পনা করা হয়, তা হলে নিম্নের পন্থাটা চিন্তা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে শহরে-গ্রামে সর্বত্র সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ছাত্রদের অগাধ মর্যাদা ও প্রভাব রয়েছে। আর আমাদের ছাত্রদের আদর্শবাদ,

ত্যাগ ও ক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে পুরো স্বাধীনতা সংগ্রামটাই রয়েছে। তাছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত সুযোগ নিয়ে যারা উচ্চতর স্কুল ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার দিকে পা বাড়াচ্ছে, উৎপাদনমূলক শ্রম ছাড়াও তাদের উপর সমাজের একটা সাধারণ দাবিও আছে। উচ্চতর স্কুলের শেষ আর বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর মধ্যে ছয় মাসের একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে এই ছয় মাস এই পর্যায়ের পুরো ছাত্র সমাজকে কাজে লাগাতে হবে গণবিদ্যালয়ের শিক্ষকতায়। কোন সৌখিন সময় কাটাবার সুযোগ হিসেবে নয়, একটি কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিষ্কার লক্ষ্য নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে তাদের এ কাজে নামতে হবে। গণবিদ্যালয়গুলো গঠিত হবে গ্রামে গ্রামে, খামারে, কারখানায়, শ্রমিক যেখানে মাটি কাটছে বা পুল বানাচ্ছে ঠিক সেখানে দিনে বা রাত্রে তাদের অবসর সময়ে। খুবই সুসংগঠিত একটি ব্যাপক গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে পরিচালক ও ট্রেড ইউনিয়নের সহায়তায় এই বিদ্যালয়গুলো গড়ে তোলা হবে। শিক্ষণীয় বিষয় হবে সোজা তিনটি —(১) অক্ষরজ্ঞান ও হিসাব শিক্ষা, (২) কৃষ্টি চেতনা, (৩) জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান। এখানে আমরা তৃতীয় বিষয়টির উপর একটু আলোচনা করতে পারি।

অশিক্ষিত জনতার মধ্যে অল্প সময়ে বিজ্ঞান শিক্ষার কথা বললে অনেকে আঁতকে উঠবেন। কিন্তু সেটা হবে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণার জন্য। স্বাস্থ্য, খাদ্য, মাটি, কৃষিকল, সার, পাম্প, পাওয়ার ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু ধারণা লাভ দেশের কোন লোকের কাছেই অসম্ভব বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। আর স্বাধীনতার যুদ্ধে যে কৃষক যেই ছাত্রের কাছ থেকে বন্দুক চালনার শিক্ষা নিয়েছে, একই ছাত্রের কাছ থেকে সে পাম্প চালাবার শিক্ষা নিতে না পারার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ছাত্রদের দেয়া বক্তৃতামূলক শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে যারা দেশব্যাপী কতকগুলো শিক্ষা প্রসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সুপরিকল্পিত অসংখ্য পোস্টার, সহজবোধ্য পুস্তিকা ও ছবি, চলমাণ শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র ইত্যাদির সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

রেডিওর বহুল প্রচার ও সহজলভ্যতার সুযোগ নিয়ে শুধু গণশিক্ষার জন্য বহু বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকারী ছাত্রদের ছ'মাসের শিক্ষকতা ছাড়াও অন্য সময়, বিশেষ করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সময় সেখানকার ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে গণবিদ্যালয়গুলো চালু রাখা যেতে পারে। মানুষ যেন গণবিদ্যালয়গুলোর সুযোগ গ্রহণ করে এবং একে গুরুত্ব দেয় সেজন্য ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে দেশময় একটা উৎসাহের জোয়ার সৃষ্টি করতে হবে। আর যারা গণবিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করবে তাদের জন্য উপযুক্ত স্বীকৃতি ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। এ শিক্ষা লাভ করা যেন সবার জন্যই একটা প্রতিযোগিতা ও সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

গণশিক্ষার জন্য এ ধরনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়। উদাহরণ-স্বরূপ কিউবার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিউবায় সমাজ বিপ্লবের সাথে সাথে প্রায় এ রকমেরই একটা পরিকল্পনা নিয়ে হাজার হাজার ছাত্র ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামে গ্রামে, সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে। যেদিন কোন খামার বা কারখানার সমস্ত শ্রমিকরা শতকরা এক'শ ভাগ শিক্ষিত হয়ে যেত, সেদিন থেকে ঐ খামার বা কারখানা বিশেষ একখানা পতাকা উড়াবার অধিকার পেত। এভাবে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে কিউবার শিক্ষিতের হার প্রায় আমাদের অবস্থা থেকে এখন শতকরা একশ' ভাগের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই গণবিদ্যালয়ের জন্য ও গণবিদ্যালয়ের ফলে মানুষের জীবন, জীবিকা ও উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসবে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক দিক থেকেও আমাদের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে সাথে সাথে। এটি শুধু যে অন্ন-বস্ত্রের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাতে সাহায্য করবে তা নয়—প্রথমবারের মত এটা বৈজ্ঞানিক বিশ্বে আমাদেরকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। এ বিজ্ঞান হবে জনগণের বিজ্ঞান, জনগণের জন্য বিজ্ঞান।

১৯৭২

সাধারণ শিক্ষায় বিজ্ঞান

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অভাব ও সঙ্কট সর্বথা ব্যাপ্ত। শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ ও সংগঠনের অভাবের কথা বাদ দিয়েও আমরা আরো গুরুতর একটি সমস্যার কথা আপাতত আলোচনা করতে পারি। সেটি হল শিক্ষার মূল সুর, এর স্বরূপ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ। ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে যখন আমরা শিক্ষার গোড়ার দিকটির কথা চিন্তা করি। কারণ প্রধানত এর উপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যতে কি ধরনের নাগরিক, কি ধরনের মানুষ তৈরি হবে। পরবর্তী যাবতীয় প্রয়োজনের সার্থকতা ও সাফল্য নির্ভর করছে এর উপর।

আমাদের বর্তমান শিক্ষার স্বরূপকে বুঝতে হলে তাকাতে হবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পাশ্চাত্য, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে। সেখানে তখন 'ক্লাসিকাল' বিষয়গুলোর উপরই একমাত্র গুরুত্ব। প্রচুর পরিমাণে ল্যাটিন ও গ্রীক একেবারে গোড়া থেকে আয়ত্ত করতে না পারলে কোন শিক্ষাই হত না। এর মাধ্যমে ছাত্রের প্রবেশলাভ ঘটত ধর্ম, প্রাচীন কাব্য, অধিবিদ্যা ইত্যাদির মধ্যে। আর ছিল শুদ্ধ গণিত। মনে করা হত একটি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি হলেই মস্তিষ্কের উচ্চ বৃত্তিগুলো জাগ্রত হবে—আর পৌরহিত্য, অধ্যাপনা, দেশ-শাসন প্রভৃতি পেশার যে কটা প্রয়োজন ছিল তাতে তো এই-ই দরকার। এরপরে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার ব্যাপ্তি কিছুটা বাড়ল, শিক্ষার মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব এল। কিন্তু মোটের উপর এটা রইল আগেকার ক্লাসিকাল শিক্ষার অনুরূপ। একে বলা হল Liberal Education অথবা Literary-Humanistic Education। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল এরকম। জার্মানীর ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম ছাড়া পাশ্চাত্যের প্রায় সব দেশেই ছিল এই একই ব্যবস্থা।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এ সময়ে ইউরোপেও আমেরিকায় বিজ্ঞানের যে প্রচণ্ড অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে শিল্পবাণিজ্যে এই

অঞ্চল অবিশ্বাস্য উন্নতি সাধন করেছিল, উপরোক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এটা কি ভাবে সম্ভব হল? এর উত্তর হলো বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিতে, এই শিল্পবিপ্লবে পুঁথিগত শিক্ষার ভূমিকা ছিল গৌণ। এর মূলে ছিলেন প্রধানত স্বশিক্ষিত সৌখীন উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক বা সরাসরি শিল্পে-বাণিজ্যে নিয়োজিত লোক। যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন শিল্পবিপ্লবের সূচনা করেছিল তার আবিষ্কারক ওয়াট্‌স বা স্টিফেনসন একাডেমিক অর্থে বিজ্ঞানী ছিলেন না। পুরো তড়িৎবিদ্যার ক্ষেত্রে এবং সাথে সাথে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের নানান শাখায় যুগান্তর এনেছিল মাইকেল ফ্যারাডের বহুমুখী আবিষ্কার। তিনি নিজে পেশায় দপ্তরী ছিলেন। যে হামফ্রে-ডেভীর বক্তৃতা শুনে তিনি প্রথম বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকেছিলেন তিনি নিজেও ছিলেন স্বশিক্ষিত। এ রকম ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া চলে। বলা হয় অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ নয়, ম্যাঞ্চেস্টার-শেফিল্ডের কামার-কারিগররাই শিল্পবিপ্লবের জন্য দায়ী। কথাটা অনেকখানি সত্য। এর সাথে অবশ্য তৎকালীন ইউরোপে ধন-তন্ত্রের বিকাশ, উপনিবেশবাজারের সুবিধা এসবও যুক্ত ছিল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে সাধারণ একাডেমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এর পরের দিকে। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী যুগের ইউরোপে পুরানো ঐতিহ্যে বিশুদ্ধ ক্লাসিকাল শিক্ষাকে ক্রমেই অবান্তর মনে করা হতে লাগল। অল্পস্বল্প পরিবর্তনও হতে লাগল। যেমন ১৮২৩ সালে 'শ্রমিকশ্রেণীর লোকদেরকে রসায়ন, যান্ত্রিক দর্শন ও ধনের সৃষ্টি ও বণ্টনসংক্রান্ত জ্ঞান দানের মানসে' স্থাপিত লণ্ডন মেকানিক্‌স ইনস্টিটিউট নিজেই এবার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ হয়ে আজকের সুপ্রসিদ্ধ বারবেক কলেজ রূপে গড়ে উঠল। শিক্ষা, বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও উৎপাদন প্রভৃতির ক্রমেই পরস্পরের কাছাকাছি এসে একীভূত হওয়ার একটা প্রবণতা এ সময় দেখা দেয়। ১৮৫১ সালে লণ্ডনের 'গ্রেট এক্‌জিবিশনের' আয়োজন করা হয় এই ঐক্যকেই মূর্ত করার জন্য। এর থেকে প্রাপ্ত অর্থের এক অংশ ব্যয়িত হল বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে Royal College of Science এর স্থাপনায়।

এর বেশ কিছু আগেই অবশ্য ফ্রান্সে একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল সুবিখ্যাত একোল নরমাল সুপেরিয়র ও একোল পলিটেকনিক। ধীরে ধীরে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই গড়ে তোলা হল এদের ধাঁচে। এমনকি সুপ্রাচীন অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের কাজকর্ম দেখে আর বোঝার উপায় রইলনা যে কিছুদিন আগেও এরা জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কহীন ধর্মীয় ও অধিবিদ্যার শুকনো তর্ক নিয়ে মেতে ছিল।

কিন্তু এসব পরিবর্তন ঘটার আগেই বিদেশী শাসকের মাধ্যমে ইউরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে কায়েম হয়ে গিয়েছিল। ঠিক অবিকৃত অবস্থায় নয়, শাসক গোষ্ঠীর বিশেষ প্রয়োজনে, বিশেষ রাজভক্ত শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তোলার কাজে একে ঢেলে সাজানো হলো। তবে মূল সুরটি ঠিক রইল, এটা হলো Literary-Humanistic। উদ্দেশ্য যাই থাক, এই শিক্ষার উপজাত হিসেবে এদেশের চিন্তাব্যবস্থায় পরিবর্তন যে কিছু এলনা তা নয়। এর প্রভাবে আমাদের সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ধীরে ধীরে চেতনার উন্মেষ হলো। কিন্তু শিক্ষার মূল সুরটির কারণে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী চেতনা এল না। ইউরোপের মত একাডেমিক শিক্ষার বাইরে সেই চেতনা সমাজকে সম্পৃক্ত করবে সে-উপায়ও ছিল না। শাসক ইংরেজ সে-পথ আগেই বন্ধ করে রেখেছিল। আমাদের যা কিছু শিল্প, কারিগরি ও নিজস্ব অর্থনীতি তা যেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইতিহাসের স্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে এগুতে না পারে তার বন্দোবস্ত করা ছিল। কাজেই জীবন ও যুগের কশাঘাতে ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার যখন স্বপ্নভঙ্গ হলো, আমাদের তা হলো না। আমাদের চারপাশে তো সেই জীবন ও সেই যুগ ছিল না। ওদের দেখেও আমরা শিখলাম না। শিক্ষার ব্যাপারে অভ্যাস ও রক্ষণশীলতা বোধ হয় সহজে মরে না। তাই ভারতীয় স্বাধীনতার পরেও শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের পুরোনো ট্র্যাডিশনের বিশেষ কোন রদবদল ঘটেনি।

ইউরোপীয় শিক্ষার সাথে সাথে বিজ্ঞান যে আমাদের দেশে একেবারে আসেনি তা নয়। তবে সেটি শিক্ষার একটা সৌখীন অনুষঙ্গ হিসেবে-

বাকি শিক্ষার সাথে মিশ-না-খাওয়া একটা দামী মশলা হিসেবে। অল্প কিছু ছাত্রের জন্যে কিছু কিছু বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হলো। এরা পরবর্তীকালে স্কুলের ঈর্ষার পাত্র সবেধন নীলমণি বি. এস.-সি. স্যার হিসেবে বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে আরো কিছু বিজ্ঞান ছাত্রকে স্ব-স্থানে আসতে সহায়তা করবে। স্কুলে ব্যবহারিক বিজ্ঞান বলতে বোঝাল কাচের আলমারীতে বিদেশী কোম্পানির ছাপমারা রকমারি সরঞ্জামের সমাবেশ যার কাছ থেকে প্রায় সবাই নিরাপদ ও সশ্রদ্ধ দূরত্ব বজায় রাখবেন। যেহেতু শিক্ষিত হওয়ার সাথে বিজ্ঞান-চেতনা লাভ করার কোন সম্পর্ক নেই, কাজেই তাতে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা কোথাও থমকে রইল না। উপরোক্ত বিজ্ঞানশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানী যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে বিশ্ববিজ্ঞানে অবদান রেখে স্মরণীয় হয়েছেন। এই ব্যবস্থার ভেতর থেকেই জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায় বা সত্যেন বসু বেরিয়েছেন—তার জন্য দেশ গৌরব বোধ করতে পারে, কিন্তু দেশের সার্বিক বিজ্ঞান-চেতনা গড়ে তুলতে তা খুব সাহায্য করে না, জীবন ও যুগকেও পরিবর্তিত করে না।

অথচ ঠিক এই সময়টিতে সারা বিশ্ব জুড়ে শিক্ষার কি ছবি আমরা দেখছি। একদিকে বিশ্লেষণধর্মী যৌক্তিক নির্ণয়নবাদী (Logical Positivism) ও অন্যদিকে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাবে যাবতীয় চিন্তা ও কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি প্রবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। অর্থনীতি, সমাজ-বিদ্যা, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, শিল্পপরিচালনা, সিদ্ধান্তপ্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রভৃতি জ্ঞানের অসংখ্য শাখা, যেগুলোকে আগে মনে করা হত তথাকথিত Humanistic শিক্ষার অংশ, আজ সেগুলো হয়ে পড়েছে এক একটি বিশেষ বিজ্ঞান। আধুনিক গণিত, সংখ্যা-তত্ত্ব, কম্পিউটার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক টেকনিক ব্যবহার না করলে এদের চলে না। যে-ভাষাতত্ত্বকে এক সময় সম্পূর্ণরূপে বৈয়াকরণের আওতাভুক্ত বলে মনে করা হত—ভিটগেনস্টাইন আর চমস্কীর যুগে তা মনস্তত্ত্বও সমাজ বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত হয়ে সামগ্রিক চিন্তা ব্যবস্থার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ রকম অবস্থায় শুদ্ধ Literary-Humanistic Education আমাদের শিক্ষাকে কতখানি কার্যকর করে তুলবে তা সহজেই অনুমেয়।

আগেই বলেছি, আমাদের দেশে বিজ্ঞান শেখার ভার আমরা গোড়া থেকেই বিশেষ একদলের উপর ছেড়ে দিয়েছি। তাঁরা হন বিশেষজ্ঞ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাজে লাগার মানুষ। বাকিদের জীবনে বিজ্ঞানের ছিঁটে-ফোঁটারও প্রয়োজন নেই। বাড়িতে 'ফিউজ' চলে যাওয়া ইত্যাকার 'টেকনিক্যাল' বিষয়ে তাঁরা নিজেকে সম্পূর্ণ নিলিপ্ত রেখে 'বিশেষজ্ঞের' শরণাপন্ন হন। বিজ্ঞানের জগৎ যে আমাদেরই জগৎ সে-কথা আমরা মানি না। গোড়া থেকেই বিজ্ঞানকে বায়ুচলাচলহীন প্রকোষ্ঠে লালিত করার ফলে এটি আমাদের আকাশে বাতাসে নেই। আমাদের চিন্তা আমাদের সংস্কৃতি তাই হয়ে পড়েছে মারাত্মক রকমের একপেশে, এ যুগের অনুপোযোগী। সমাজের সাথে যোগাযোগের কোন সাধারণ ভাষা না থাকাতে বিজ্ঞানীরাও হয়ে পড়েছেন অন্য জগতের মানুষ। উভয়বিধ কারণে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে, অর্থনীতির সাথে, উন্নয়নের সাথে, বাঁচামরার সাথে, শিক্ষার সংযোগটি খুবই ক্ষীণ।

এর প্রতিকার করতে হলে প্রথমেই নজর দিতে হবে স্কুলের দিকে; সাধারণ শিক্ষার দিকে। সর্বসাধারণের মনে বিজ্ঞান চেতনার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত করতে হবে এখান থেকেই। বিজ্ঞান সাধারণ পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে পরিবেশের সাথে, অন্যান্য পাঠ্যের সাথে খাপ খেয়ে। এর উদ্দেশ্য হবে শুধু ভবিষ্যতের বিশেষজ্ঞ তৈরি নয়, ভবিষ্যতের সমন্বিত চিন্তায় সক্ষম নাগরিক তৈরিও বটে। বিজ্ঞানের Formalism অর্থাৎ বিধিবদ্ধ রূপের উপর এ স্তরে বেশী জোর না দিলেও চলবে। কতকগুলো বাঁধা সূত্র বা নিয়ম চোখ বুজে মেনে নিয়ে তার থেকে নানা Deduction ও ফলাফল টানার চেয়ে উল্টো Inductive পদ্ধতিকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ সত্যিকার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিয়মগুলো ওভাবেই এসেছে। নানারকম পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে যৌক্তিক উপায়ে নিয়মের দিকে, সিদ্ধান্তের দিকে যাবার অভ্যেস এখান থেকেই করতে হবে। তথ্য দিয়ে

ভারাক্রান্ত করা নয়, অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলাই হবে লক্ষ্য। 'নিজে কর, প্রকৃতির দিকে তাকাও' এই ভিত্তিতে অনেকখানি বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া যায় আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ছাড়াই। প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজের সাথে সজ্ঞান আত্মীয়তা স্থাপনের মারফতেই ঘটবে শিশুর বিজ্ঞানজগতে প্রবেশ। স্কুলের সাথেই থাকবে একটা ছোট-খাট ওয়ার্কশপ—কাঠ, ধাতু, কাচ ইত্যাদির ভাঙ্গা-গড়ার জন্য। থাকবে গাছ-গাছড়া লাগাবার জায়গা, পোকামাকড় রাখার ও পোষার ব্যবস্থা। আত্মীয়তা শুরু হবে এখান থেকেই। অভ্যেস হবে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের, তথ্য সংগ্রহের, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার। কাছাকাছি কারখানায়, কামারশালায়, চাষের ক্ষেত্রে, নার্সারীতে, বনে বাদাড়ে, নানান শিলাপাথর বা মাটি-অধ্যুষিত অঞ্চলে **field trip** নেবে ছাত্রেরা। সখের ভ্রমণ হিসেবে নয়, স্কুলপাঠ্যসূচীর অংশ হিসেবে। যদ্দূর সম্ভব নিজস্ব পরিবেশ ও নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষার পরিকল্পনা নিতে হবে।

উপরোক্ত লক্ষ্যের দিকে খেয়াল রেখে পাঠ্যসূচীকেও ঢেলে সাজাতে হবে। একদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সাধারণভাবে পরিচিত হওয়া, অন্যদিকে আমরা সবাই ব্যবহারিক জীবনে যে সব জিনিসের সাথে বাস করি সেই মাটি, সার, খাদ্য, স্বাস্থ্য, তড়িৎ, জ্বালানী, আবহাওয়া, ইত্যাদির সাথে একটা সক্রিয় সম্পর্ক স্থাপন—এই দুইই করতে হবে। তবেই পরবর্তী জীবনে আমরা লেখক, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ বা পদার্থবিদ যাই হই না কেন আমাদের মূল শিক্ষা ঠিক থাকবে। একই কথা সমাজবিজ্ঞানের সাথে এবং সঙ্গীত ও চারুকলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাধারণ গণিতকেও পাঠ্যসূচীতে রাখতে হবে। তবে চক্রবৃদ্ধি সুদকষাজাতীয় ভীতিপ্রদ ও অপ্রয়োজনীয় পাঠ্যের পরিবর্তে গণিতের 'লজিকের' দিকটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। সাথে সাথে বিজ্ঞানের যৌক্তিক বিশ্লেষণে যে-সব গাণিতিক হাতিয়ার পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন হবে সযত্নে সেদিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মজার ব্যাপার হলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গণিতের অনেক জিনিস

পড়ানো হয় যা স্কুল গণিতের চেয়ে বেশী উপভোগ্য তো বটেই অনেক সময় সহজতরও। এগুলো কিশোর-মনে অধিকতর দাগ কাটতেও সক্ষম। অথচ এগুলো দেরিতে পড়ানো হয় বলে পরবর্তীকালে বিজ্ঞান শিক্ষায় অযথা বিঘ্ন ঘটে। পাঠ্যসূচীতে আর একটা জিনিস থাকা প্রয়োজন, তা হলো বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং সাধারণভাবে মানবচিন্তা বিকাশের ইতিহাস। এর অভাবে সঠিক বিজ্ঞানচেতনা সৃষ্টি অসম্ভব। অনুসন্ধিৎসা, প্রয়োজন আর সৃজনশীলতার তাগিদে কিভাবে মানুষ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বৈজ্ঞানিক মনন ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছে; রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ইতিহাসের সাথে কিভাবে এটা জড়িত, তা শেখানো আমাদের শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। ইতিহাস এখনো পাঠ্য আছে। কিন্তু সেটা প্রধানত রাজা-রাজড়ার, আমাত্যআমলার ইতিহাস—সন তারিখ, যুদ্ধবিগ্রহ আর ষড়-যন্ত্রের কাহিনীতেই এটা শেষ হয়ে যায়। তাতে নেই মানবচিন্তার, মানবসমাজের আর শিল্পকলার ইতিহাস। আমাদের সমন্বিত সংস্কৃতির বিকাশে এ শিক্ষা কেমন করে সাহায্য করবে?

যাঁরা পরে বৈজ্ঞানিক পেশা গ্রহণ করবেননা বা বিজ্ঞানের কোন শাখায় বিশেষজ্ঞ হবেন না তাঁদের পক্ষেও উপরোক্ত সাধারণ শিক্ষা অপরিহার্য হবে কয়েকটা কারণে: (১) বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কর্ম-পদ্ধতির সাথে তাঁরা মোটামুটি পরিচিত থাকবেন। নিজেদের চিন্তা, জীবন ও জীবিকার নানা সমস্যাকে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মোকাবেলা করতে পারবেন। (২) ব্যবহারিক জীবনে তাঁদের একটা বৈজ্ঞানিক পারি-পার্শ্বিকতার মধ্যে বাস করতে হয়। খাদ্য, স্বাস্থ্য থেকে আরম্ভ করে জীবনের বহু সমস্যা ও সামগ্রী এর আওতাভুক্ত। সহজতর জীবনের জন্য এগুলোর সাথে জ্ঞানের ভিত্তিতে কিছুটা সখ্যতা জন্মানোই কাম্য। পুরো ব্যপারটিকে বিজাতীয় রহস্য মনে করে থাকলে এযুগে উন্নত জীবন যাপন অসম্ভব। (৩) আমাদের সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক মোড় নেবার ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা বিষয়, এর প্রয়োগ, এর দর্শন সাধারণ-

ভাবে জানার, চিন্তার ও আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। এতে অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয় ভিত্তি যেন সবার শিক্ষায় থাকে। তাছাড়া বিজ্ঞানবিশেষজ্ঞ না হয়েও কেউ যদি প্রয়োজন বা অনুসন্ধিৎসার কারণে এর কোন একটি বিষয়ে উৎসাহী হন তিনি যেন নিজ উদ্যোগে স্বশিক্ষা চালিয়ে যেতে পারেন। (৪) দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যা প্রয়োজন তা হল বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে বোঝাবুঝি ও সহযোগিতা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের সাথে সবার চিন্তা ও কাজকে নানা-ভাবে সমন্বিত হতে হবে। কাজেই চাই, সবার জন্য অন্তত গোড়ার দিকে একটা সুসমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা।

উপরোক্ত লক্ষ্যে আসতে স্কুলশিক্ষার বাইরেও আমাদের নজর দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও শিশু কিশোর ও সাধারণের উপযোগী একটি ব্যাপক বিজ্ঞান-সাহিত্যের সৃষ্টি করতে হবে। ভাল শিশুসাহিত্যের অভাব বা গল্পকবিতার অভাবের মত একেও আমাদের অভাব হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে এর পূরণে সচেষ্ট হতে হবে। বিজ্ঞানসাহিত্যে, বিশেষ করে Do-it-yourself ধরনের বইপত্র, শিশুমনকে কিভাবে নাড়া দেয়, তাদেরকে কতখানি বিজ্ঞানমনা করে তোলে তা এদ্দিনকার ইংরেজী -মাধ্যম স্কুলের ছেলে-মেয়েদের দেখলেই বোঝা যায়। ইংরেজী বিজ্ঞান-সাহিত্যে প্রবেশাধিকারই এর প্রধান কারণ। ব্যাপকভাবে বয়স্কশিক্ষার কোন পরিকল্পনা যদি নেয়া হয় তবে সেখানেও অক্ষর-জ্ঞানের সাথে সাথে যা শিক্ষা দিতে হবে তা হলো জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও কারিগরির সহজ ও সাধারণ কিছু জিনিস। নিজের সুখ, স্বাস্থ্য, খাদ্য, জীবিকার সাথে সম্পর্কিত সহজ জ্ঞানগুলোই যদি না পেল তা হলে গণশিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

সবশেষে মনে রাখতে হবে শিক্ষার কোন শাখায় কোন পর্যায়ই শেষ কথা নয়। যেভাবে যে-কোন রকমের শিক্ষা ব্যবস্থাই আমরা নিই না কেন এর কোন দিক যেন কানাগলি না হয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান

শিক্ষার ক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য। যে কোন পেশায় নিয়োজিত লোক যেন প্রয়োজনমত কোন প্রতিষ্ঠানে এসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ বিদ্যা বা টেকনিক আয়ত্ত করে নিতে পারেন সে-সুযোগ থাকতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে টেকনিক্যাল কলেজ অথবা ওপেন্ ইউনিভারসিটি গোছের জায়গায় এ ধরনের উন্মুক্ত সুযোগ রয়েছে। এখানে পেশাদার মানুষ এক এক সময় গিয়ে Computation,Management,Electronics এর মত একটা ক্রমাগ্রসরমান বিদ্যা বা Glass blowingএর মত একটা প্রয়োজনীয় টেকনিক আয়ত্ত করতে পারেন। এটিই শিক্ষার সচলতা সর্বজনীনতা ও জীবনমুখিতার লক্ষণ।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতেও অনুরূপ সুযোগ থাকতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা সংস্কারে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক রূপরেখা যাই হোক না কেন তা রচনা করতে হবে একটি মূল সুরের দিকে লক্ষ্য রেখে। সেই মূল সুরটি যেন যুগ ও জীবনের উপযোগী সমন্বিত সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

১৯৭৬

স্কুলের পদার্থবিদ্যায় শিক্ষা উপকরণ

আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে পদার্থবিদ্যার প্রতিটি বিষয় যে সম্পর্কিত তা শিক্ষার্থী হৃদয়ঙ্গম করবে একমাত্র তখন যখন এই সম্পর্কটি হাতে নাতে তার কাছে ধরা পড়বে। এই কারণে শিক্ষার একেবারে গোড়া থেকেই উপকরণের প্রশ্নটি এসে পড়ে যার মধ্য দিয়ে পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো প্রত্যক্ষ হতে পারে। আমাদের মুশকিল হলো পদার্থবিদ্যা শিক্ষার উপকরণগুলো ছাত্রগণ প্রথম দেখে কলেজে বা স্কুলে উপরের দিকে গিয়ে। তখন সেগুলো তাদের কাছে দেখা দেয় শক্ত প্রাণহীন 'এপারেটাসে'র আকারে। আমাদের অধিকাংশ শিশু যেখানে টেকনোলোজীর সংস্পর্শ-বিহীন খুবই সাদামাটা প্রতিবেশে মানুষ, তাদের জন্য এই 'এপারেটাস' বিধিবদ্ধ কাজের জিনিস যতখানি ঔৎসুক্যের জিনিস হওয়া গতি ততখানি হয়ে উঠতে পারে না। তাই উপকরণ প্রয়োজন আরো গোড়া থেকে ; আর এই উপকরণ কোম্পানির ছাপমারা মোড়কে না এসে, যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর নিজস্ব অংশ গ্রহণে প্রতিবেশের নানা জিনিস থেকে সৃষ্টি করতে পারাটাই অধিকতর মঙ্গলজনক। এটিই আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এর একটা বাড়তি সুবিধাও অবশ্য রয়েছে, সেটি অর্থনৈতিক। ইচ্ছে করলেও কোম্পানীর তৈরি নিখুঁত উপকরণ ব্যবহার আমাদের জন্য অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, বিশেষ করে অসংখ্য স্কুলের কথা চিন্তা করলে, প্রায় অসাধ্য।

ছাত্রদের অংশ গ্রহণে উপকরণ তৈরির প্রশ্ন কিভাবে আসে সেটি কিছু উদাহরণ থেকে স্পষ্ট করা যাক। ডিগ্রী বা তদূর্ধ্বে পাস করে যাচ্ছে এমন অনেক ছাত্র পাবেন যারা Calibration কথাটির মানে বুঝিয়ে দিতে পারছে না। অথচ স্কুল থেকে শুরু করে বহুবার সে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যন্ত্র-পাতির Calibration-এর কথা পড়েছে, পরীক্ষায় উত্তর করেছে ; এমন কি এই সংক্রান্ত এক্সপেরিমেণ্টও করেছে জটিল সব যন্ত্র দিয়ে। আমার

মনে হয় বিষয়টির রহস্য মোচন হওয়ার দরকার ছিল প্রাইমারী স্কুলের কোন শ্রেণীতে একটা চাঁছা বাশের কঞ্চিকে ফুটরুলের সাথে দাগে দাগে মিলিয়ে আর একটা ফুটরুল তৈরির মাধ্যমে। বহু বছর ধরে হাজারবার π (পাই) কথাটি গণিতে পদার্থ বিদ্যায় অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে আসছে অথচ π এর মানেটা বোঝেনা এমন ছাত্রের সাক্ষাৎ খুব বিরল ঘটনা নয়। শিক্ষার কোন পর্যায়ে বিভিন্ন সাইজের খেলনা চাকা বা টিনের কৌটা নিয়ে যদি শিক্ষার্থীকে তার সব কটির ব্যাস আর পরিধির অনুপাত মেপে বের করতে বলা হতো, তা হলে সেটি ভুলা শক্ত হতো।

গ্যালভানোমিটার শব্দটি এমনিতেই খটমটে। তার উপর হরেক আকারের, হরেক বহরের এই নামধারী যন্ত্র যত বেশি দেখতে থাকে শিক্ষার্থীর কাছে এটি ততই রহস্যাবৃত হতে থাকে। অথচ স্কুলে প্রত্যেক ছাত্র পালাক্রমে একটি করে গ্যালভানোমিটার কেন তৈরি করবেনা তার কোন কারণ নেই। কিছু আবৃত তার আর একটা দিগদর্শক কম্পাস এর জন্য যথেষ্ট হবে। এই তৈরি করার মাধ্যমে (১) যন্ত্রটির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে, (২) ওয়েস্টোন ও আম্পায়ারের পরীক্ষা স্পষ্ট হবে, (৩) ক্যালিব্রেশন ব্যাপারটা নিজের গরজে আবার করা হবে, (৪) তারপর নিজের বানানো গ্যালভানোমিটার দিয়ে ব্যাটারী পরীক্ষা, বিভিন্ন তারের তুলনামূলক পরিবাহিতা পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আনন্দ লাভ করা যাবে।

তৈরি রেজিস্টর দিয়ে কাজ করার সাথে সাথে একবার কিছু তার কেটে কেটে বিভিন্ন মাপের কয়েকটা রেজিস্টর তৈরি করাটা বেশ শিক্ষণীয় হতে পারে। নানা আকারের বহু বাক্সের অন্তর্নিহিত গোমর এতে ফাঁক হয়ে যেতে পারে।

আর একটু পিছিয়ে গিয়ে আরো মৌলিক জিনিসের দিকে তাকাতে পারি। নিক্তিতে ওজন নেবার সময় ওয়েট বক্সটা সব সময় মূল্যবান একটি সামগ্রী হিসেবে ছাত্রের হাতে তুলে দেয়া হয়। এমন কি চিমটি ছাড়া ওজনগুলোকে ছোঁয়াও বারণ। এই গ্রাম মিলিগ্রামগুলোর জন্ম কোথায় সে প্রশ্ন একবারও ওঠেনা। কোন এক সময় একবার

শিক্ষার্থীরা নিজেরাই এলমুনিয়ামের পাতলা পাত কেটে নিজেরা এগুলো তৈরি করলে মন্দ হয়না। নির্দিষ্ট আয়তনের পানির ওজন ব্যবহার করে এই কাজ করলে সাথে সাথে পরিষ্কার হয়ে যাবে 'গ্রাম' কথাটার মানে কি? বাঁশের চোঙ্গার পিচকিরি, পলিথিনের টিউব ইত্যাদির মারফত পাম্প, সাইফন ইত্যাদি তৈরি করে হাইড্রোডাইনামিক্সকে বেশ অর্থবহ করে তোলা যায়।

সব যন্ত্র সরল যন্ত্রের সমন্বয়ে তৈরি। এই সব সরল যন্ত্র তথা লীভার, পুলি বা ইনক্লাইনড প্লেনের যান্ত্রিক দক্ষতা বোঝাতে যা যা দরকার সব আয়োজনই ছাত্রেরা করতে পারে অতি সহজে। এক সময় বলা হতো পদার্থবিদ্যার মূল বিষয়গুলো string আর sealirg wax দিয়েই স্পষ্ট করা যায়—কথাটা একেবারে বাসি হয়ে যায়নি।

শুরুতেই অপটিকাল বেঞ্চের দৃঢ় সংবদ্ধতার মধ্যে না নিয়ে লেন্স আর আয়না নিয়ে কিছু স্বাধীন নাড়াচাড়া শিক্ষার্থীর মনে গভীরতর রেখাপাত করতে পারে। অতসী কাঁচ, পেরিস্কোপ বা দুরবীনের আকারে এদের সাজাতে গিয়ে তারা নিজেরাই অনেক কিছু জেনে নিতে পারে।

উপকরণ গড়ে তোলা, এর পরিবর্তন, এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা সবকিছুতে যদি শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ হাত থাকে তবেই ব্যাপারটি তাকে ভাবাতে পারে, তার মনে দাগ কাটতে পারে, তাকে আনন্দ দিতে পারে। অপরপক্ষে নষ্ট হবার ভয়ে যেখানে যন্ত্রে হাত দেয়া বারণ, বইয়ের নির্দেশগুলো একের পর এক করে নিয়ে-সুনির্ধারিত ফল লাভই যেখানে লক্ষ্য, উপকরণের উপযোগিতা সেখানে পুরাপুরি লাভ করা সম্ভব নয়—গোড়ার দিকে তো নয়ই। পঠিত বিষয়ের সাথে সরাসরি যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই উপকরণ সেই সরল সম্পর্ক তখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

পদার্থবিদ্যার ল্যাবোরেটরীতে হাতুড়ি করাত কাঁচের ব্যবহারও অত্যন্ত প্রাজিক। এই ব্যবহারের অভ্যাস যত তাড়াতাড়ি হবে উপকরণের সাথে সম্পর্ক স্থাপন তত সহজ হবে। সজ্জা প্রধান কিছু

ছাত্রের অভাব এখন নেই, ভবিষ্যতেও হবেনা যাদের জন্য সব কিছু নিজের হাতে করে দেখার প্রয়োজন হয়ত ততটা নেই।
কিন্তু সাধারণভাবে সব ছাত্রের মৌলিক শিক্ষার অর্থবহতার প্রশ্ন যদি তোলা হয়, পদার্থবিদ্যার ধারণাগুলোকে আবার করার প্রশ্ন যদি গুরুত্ব পায় তা হলে সুনির্দিষ্ট সাজানো এক্সপেরিমেন্টের সাথে সাথে এ রকম নমনীয় উপকরণ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী।

এই শেষোক্তটির জন্য প্রাথমিক পুঁজি লাগবে খুবই কম। যা লাগবে তাও সাধারণ সব জিনিস, স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব। এখানে আসল পুঁজি হবে ছাত্র শিক্ষকের আগ্রহ, সৃজনী-শক্তি ও ক্রমবর্ধমান কুশলতা।

এ পর্যন্ত এদিক থেকে বিশেষ কোন উদ্যোগ বা চিন্তাভাবনা এদেশে তেমন হয়নি। আন্তর্জাতিক শিশু তহবিলের উদ্যোগে ভারতের পটভূমিতে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। তাও একেবারে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রের জন্য। আজকাল আমাদের দেশে ছেলে মেয়েদের নিজস্ব উদ্যোগে যে সব বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছে তাদের কিছু কিছু প্রবণতা ও কর্ম-তৎপরতা এই ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। স্কুলের কথা খেয়াল রেখে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হলেও এর স্পিরিটটি শিক্ষার সব স্তরে পরিব্যপ্ত হতে পারে। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনায় ছাত্রদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণের সৃষ্টি ও ব্যবহারের এই বিষয়টি মনোযোগ লাভের দাবি রাখে।

১৯৭৬

ব্রিটেনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও আমরা

ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ব্রিটিশ টেলিভিশনে এর উপর একটা আলোচনা হচ্ছিল। নানা কথার ভেতর প্রশ্ন উঠল ওপেন ইউনিভার্সিটি এ পর্যন্ত ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত দেশগুলোতে প্রচুর সাড়া ও উৎসাহ যুগিয়েছে বটে কিন্তু উন্নয়নকামী দেশগুলোতে কি এই জাতীয় প্রচেষ্টার কোন ভবিষ্যৎ আছে? আলোচনাকারীরা এ প্রশ্নে দু'দলে ভাগ হয়ে গেলেন। এক দল বল্লেন, ওপেন ইউনিভার্সিটির আইডিয়াটি ও প্রয়োজনটি সৃষ্টি হয়েছে শিল্পোন্নত দেশের জন্য। নিত্য অগ্রসরমান কারিগরি ও অন্যান্য জ্ঞানের সাথে সবার তাল মিলিয়ে চলার প্রয়োজন এখানে বেশি। জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে বিভিন্ন পেশাগত শ্রেণীর মধ্যে অবসর সময়ে কিছু বাড়তি জ্ঞানার্জনের বা দেরিতে হলেও একটা ডিগ্রি লাভের চেষ্টার বিলাসিতা এখানে পোষায়। তাছাড়া যে সব টেকনিক ও যান্ত্রিক সুযোগ সুবিধার ফলে ব্রিটেনে ওপেন ইউনিভার্সিটি সফল হয়েছে তা একমাত্র শিল্পোন্নত দেশেই সম্ভব। কিন্তু অন্য দলের মতে ওপেন ইউনিভার্সিটি শুধু একটা ভিন্ন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, এটা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিপ্লবাত্মক নূতন ধারণাও বটে। উন্নত-অনুন্নত সব দেশের পক্ষেই এই নূতন ধারণা গুরুত্বপূর্ণ এবং সবাই যার যার প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এই ধারণাকে কাজে লাগাতে পারবে। আমি নিজে এই দ্বিতীয় মতের সমর্থক বলে ওপেন ইউনি-ভার্সিটির বিষয়টিকে আমাদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি।

যদিও ওপেন ইউনিভার্সিটির বয়স প্রায় দু'বছর হতে চল্‌ল, এদেশে অনেকেই এর নাম শোনেননি বা শুনলেও এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না। এই কারণে গুরুত্বের কথা তোলার আগে ওপেন ইউনিভার্সিটির পেছনে কি উদ্দেশ্য ও ধারণা কাজ করছে এবং এর পদ্ধতি ও সংগঠন সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি আমাদের জানা প্রয়োজন।

ব্রিটেনের শ্রমিক সরকারের আমলে ওপেন ইউনিভার্সিটির পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং এই সরকার ক্ষমতাচ্যুত হবার ঠিক আগে আগে এ সম্পর্কে সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়। এর পেছনে উদ্দেশ্য হল নিম্নরূপ। যদিও জীবনের প্রথম অংশকে শিক্ষালাভের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, এটাই শিক্ষা লাভের একমাত্র সময় হওয়া উচিত নয়। একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশির ভাগ লোকই একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্কুলশিক্ষা শেষ করে নানা উৎপাদনমূলক কাজে চলে যায়। কিন্তু তাই বলে উচ্চ শিক্ষার আশীর্বাদ থেকে তারা চিরতরে বঞ্চিত হবে কেন? তাছাড়া প্রথম বয়সে এক ধরণের উচ্চ শিক্ষা নিলেই বা কি? জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ যে ভাবে দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে দশ বছর পরে গিয়ে তা কি আর ওভাবে কাজে আসে? তার অনেক কিছু আবার ঝালিয়ে নিতে হয়। নূতন নূতন বিষয়ে উৎসাহও জন্মাতে পারে। ব্যক্তিগত পড়াশুনা আর শর্টকোর্স করে সব সমস্যার সমাধান হয় না। প্রয়োজন, অবসর সময়ে বেশ সময় নিয়ে সচেষ্টভাবে সুপরিচালিত পড়াশুনার। প্রয়োজন সে জ্ঞান যাচাই করার ব্যবস্থার। এই ফাঁকে একটা ডিগ্রি পেতেও আপত্তি কি?

তাছাড়া আরো প্রশ্ন আছে। স্কুলঘর, সারিবদ্ধ টুল-চেয়ার, মুখোমুখি সামনা সামনি মাস্টারের লেকচার, রোলকল, একসাথে শুরু আর শেষ করা ইত্যাদি যাবতীয় অনুষঙ্গ ছাড়া শিক্ষা কি সম্ভব নয়? বিশেষ করে এর বিকল্প যখন হয় এ যুগের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির প্রামাণ্য দলিল পত্রের, আর বহু যোগ্য শিক্ষকের সমবেত গবেষণার সুযোগ নিয়ে দেয়া শিক্ষা, তখন এটা ভাববার কথা বৈ কি? শিক্ষা যেখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত, গরজটা যেখানে বালাই নয় সেখানে শেষোক্তটা অধিকতর কাম্যও হতে পারে। এ সম্বন্ধে অবশ্য অনেকের অনেক সন্দেহ আছে। ওপেন ইউনিভার্সিটি এদিক থেকে একটা বিরাট এক্সপেরিমেন্ট। এতে এটা ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা সফলও হয়েছে।

সামাজিক সুবিচারের দিক থেকে ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রয়োজন আছে। ব্রিটেনে অনেকে একে দ্বিতীয় চান্সের ইউনিভার্সিটি বলে।

এই দ্বিতীয় চান্সটি জীবনে অনেকেরই খুব প্রয়োজন। কৈশোরের অপরিপক্কতার জন্য বা আর্থিক কারণে বেশী লেখাপড়া যাদের হয়ে উঠে না তাদের অনেকেই হয়তো এই চান্সটি চাইবে। এতে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মনের দিগন্ত যে রকম প্রসারিত হয় তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রে চাকরি ও পেশায় উন্নতিরও সুযোগ থাকে। মোট কথা, শিক্ষাকে সার্বক্ষণিক, সর্বজনীন ও সর্ব প্রয়োজনে পাওয়ার ব্যবস্থাই ওপেন ইউনিভার্সিটির কাজ।

ওপেন ইউনিভার্সিটির একটি নূতন দিক হলো এতে ভর্তি হতে আগের কোন রকম স্কুল কলেজে শিক্ষা বা কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় না। ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্ররা নিজেদের সম্বন্ধে নানা তথ্য জানিয়ে একটা ফরম পূরণ করেন। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সেই অনুসারে তাঁদেরকে বিষয়, পড়ার চাপ ও সাফল্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে থাকেন। এই উপদেশ ছাত্রের মানতে হবে এমন কোন কথা নেই। তিনি নিজের পরিকল্পনামতেই এগুতে পারেন। এক বছর পর অবশ্য পরীক্ষা ও অন্যান্য নানা যাচাইক্রিয়ার ফলাফলের উপর নির্ভর করবে তিনি ঐ কোর্স নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন কি পারবেন না। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এরকম শর্তবিহীন ভর্তির পরেও প্রথম বছরের ছাত্রদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র এক অংশকেই বাদ পড়তে হয়েছে। অথচ পরীক্ষা ও যাচাইক্রিয়ার কড়াকড়ি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে এখানে কম নয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত লেখাপড়ার এই সুবিধা।

যে প্রশ্নটি সবার মনে বেশি জাগতে পারে তা হলো ওপেন ইউনিভার্সিটির শিক্ষাদান পদ্ধতিটি কি? এই ব্যাপারে বহু ভুল ধারণা আছে। বেশির ভাগ লোক মনে করেন এটা টেলিভিশন ক্লাসের ইউনিভার্সিটি। অনেকে আবার মনে করেন এটা চিঠিপত্রের মাধ্যমে ইউনিভার্সিটি। আসলে এই দুই পদ্ধতি ও আরো অনেক পদ্ধতির সমন্বয়ে এর শিক্ষাদান ব্যবস্থা। এর কোন একটিকে বাদ দিলে ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রতি অবিচার করা হয়। আমরা এখন এর প্রত্যেকটিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

পত্রপ্রেরিত পাঠ

প্রত্যেক সপ্তায় পঠিতব্য বিষয়সমূহের টেক্সট, এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী ও পাঠ্যতালিকা ডাকযোগে ছাত্রের বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ের আগে তাঁকে এই টেক্সট মোটামুটি একবার পড়ে ফেলতে হয়। বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্র্যাকটিকাল নানা কাজের নির্দেশও এতে থাকে। তাছাড়া থাকে 'বাড়ির কাজ' যা সম্পাদন করে ডাক যোগে আবার পাঠিয়ে দিতে হয়। বলা বাহুল্য, ওপেন ইউনিভার্সিটির নিজস্ব খামে ডাক আদান প্রদানের জন্য কোন ডাক টিকেট লাগে না।

টেলিভিশন ও রেডিও

টেলিভিশন ও কোন কোন ক্ষেত্রে রেডিওতে নির্দিষ্ট সময় এক এক বিষয়ের উপর আধ ঘণ্টা স্থায়ী ক্লাস থাকে প্রতি সপ্তায়। প্রায়ই একাধিক অধ্যাপক ক্লাস পরিচালনা করেন এবং এতে প্রয়োজনমত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, ডেমোনস্ট্রেশন, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ছবি, দলিলপত্র এবং সময় সময় প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থাকে। যেমন ভূ-বিদ্যার ক্লাসে হয়তো দেখা গেল অধ্যাপক আলোচ্য শিলা অধ্যুষিত অঞ্চলে হাঁটতে হাঁটতে বক্তৃতা দিচ্ছেন—প্রয়োজনমত এক এক টুকরা পাথর ভেঙ্গে তার 'ক্লোজ-আপ' দেখাচ্ছেন। কারিগরি ক্লাসে হয়ত দেখা গেল বক্তৃতার ফাঁকে এক সময় তিনি হকার সিডলী বিমান নির্মাণ কারখানায় হাজির হয়েছেন এবং স্থানীয় প্রকৌশলীর সাহায্যে যন্ত্র-কৌশলের কোন একটি বিষয় বোঝাচ্ছেন। এমন কোন সুযোগ, দলিল, প্রামাণ্য চিত্র বা যন্ত্র নেই যা ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারে না। কেমব্রিজের ক্যাভাণ্ডিশ ল্যাবোরেটরীতে হয়ত চলছে পদার্থ বিদ্যার একটা জটিল এক্সপেরিমেণ্ট। ওপেন ইউনিভার-সিটির ছাত্ররা টেলিভিশনের পর্দায় মীটার থেকে নানা রকম তথ্য টুকে নিচ্ছেন, কার্যকারিণগুলো খেয়াল করছেন—পরে তাঁরা এসব বিশ্লেষণ করে দেখবেন। টেলিভিশন ক্লাসের উপযোগী করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে পুরো নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি। যেমন বিভিন্ন রেখাচিত্রের বা গাণিতিক

পর্যায়গুলোর পরিবর্তন সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য সুকৌশলে একরকমের যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে।

এ ধরনের ক্লাসের আরেকটা বড় সুবিধা হলো এক একটা ক্লাসের জন্য কয়েকজন অধ্যাপক, বিশেষজ্ঞ ও সহকারীর দল বহু গবেষণা ও পরিশ্রমের পর এগুলো খাড়া করেন। তারপর এর ভিডিও টেপ ও চলচ্চিত্র তৈরি করে ফেলা হয় টেলিভিশনে দেখাবার জন্য। ফলে প্রতিটি ক্লাসের পেছনে অনেকখানি চিন্তা, পরিশ্রম ও সম্পদ ব্যয়িত হয়। পত্রপ্রেরিত পাঠ্যের ফলে ছাত্ররা আগে থেকেই বিষয়টি মোটামুটি জানেন। টেলিভিশন বা রেডিও ক্লাসের মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হলে তাঁরা এর উপর বিস্তারিত পড়াশুনা, বাড়ীর কাজ ইত্যাদি শুরু করতে পারেন।

প্রতিটি বিষয়ের পুরো পাঠক্রমকে কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করা হয়। এক একটা টেলিভিশন বা রেডিও ক্লাসে একটি ইউনিটের উপর পাঠ দেয়া হয়। হিসেব করে দেখা গেছে যে ঠিকভাবে আয়ত্ত করার জন্য এক একটা ইউনিটের উপর দশ ঘন্টার মত ব্যয় করতে হয়। এর মধ্যে টেলিভিশন বা রেডিও ক্লাস মাত্র আধ ঘন্টার। বাকি অন্যান্য কাজ।

পাঠকেন্দ্র

ব্রিটেনের ছোট বড় সব জনপদে ওপেন ইউনিভারসিটির অনেক পাঠ-কেন্দ্র আছে। এখানে রাখা থাকে যাবতীয় পাঠ্য বস্তু। সম্প্রতি দেওয়া নানা টেলিভিশন ক্লাসের ভিডিও টেপ ও ফিল্ম। ছাত্ররা যে কোন সময় ওখানে গিয়ে এসব টেপ চালিয়ে ক্লাসটি পুনর্বার এবং দরকার হলে বার বার দেখে নিতে পারেন।

স্থানীয় টিউটর

প্রত্যেক অঞ্চলে ওপেন ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিষয়ে বেশ ক'জন ফুল টাইম ও পার্ট টাইম শিক্ষক থাকেন। পার্ট টাইম শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয় সাধারণত স্থানীয় ইউনিভারসিটি বা কলেজ শিক্ষকদের মধ্য থেকে। ঐ অঞ্চলের ছাত্ররা যার যার টিউটরের কাছে গিয়ে আলাপ করতে পারেন। প্রয়োজনীয় জিনিস বুঝে নিতে

পারেন। ওপেন ইউনিভারসিটির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা যেটা ছাত্র শিক্ষকের সরাসরি যোগাযোগের অভাব তা এভাবে কিছুটা দূর করা হয়। তা ছাড়া দরকার হলে ছাত্ররা কেন্দ্রীয় শিক্ষকমণ্ডলীর সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন তাঁদের কোর্স সম্বন্ধে।

বাড়ির প্র্যাকটিকাল সরঞ্জাম

বিজ্ঞান ও কারিগরির ছাত্রদের বছরের শুরুতে একসেট করে সরঞ্জাম দেওয়া হয় এবং পরে এসব ফেরত নেওয়া হয়। এধরনের সরঞ্জাম বহু সংখ্যায়, বিশেষ প্রয়োজনে তৈরি করতে হয় বলে ওপেন ইউনিভা-সিটির জন্য এক ধরনের নূতন শিল্পই সৃষ্টি হয়েছে। হালকা, সহজে ব্যব-হারযোগ্য অথচ টেকসই যন্ত্রপাতি তৈরি করতে গিয়ে বহু চমৎকার উদ্ভাবন কৌশলের পরিচয় পাওয়া গেছে। যেমন ওপেন ইউনিভারসিটির ছোট্ট পকেট সাইজের অথচ শক্তিশালী অনুবীক্ষণটি বছরের সেরা উদ্ভাবনের পুরস্কার পেয়েছে। যন্ত্রগুলোর পরিকল্পনায় আধুনিকতা সর্বত্র প্রত্যক্ষ। উদাহরণ স্বরূপ কারিগরি ফাউণ্ডেশন কোর্সের সব ছাত্রকে নিম্নলিখিত জিনিসগুলো সরবরাহ করা হয়: নানা রকম 'লজিক' সার্কিট তৈরি করবার জিনিস, অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার, ট্রানজিসটর সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক খুচরা অংশ, সরল এনালগ কম্পিউটার, মালটিমিটার, ছোট মোটর ইত্যাদি। বাড়ির প্র্যকটিকাল কাজ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য ওপেন ইউনিভারসিটির ছাত্রদের স্থানীয় টেকনিক্যাল কলেজের ল্যাবোরেটরীতে কাজের সুযোগ থাকে।

বাড়িতেই নানা সরঞ্জাম থাকার ফলে হাতে কলমে পড়ার সাথে ঘনিষ্ঠতা ওপেন ইউনিভারসিটির ছাত্রদেরই বরং বেশি জন্মে। এঁরা যখন আর যতক্ষণ খুশি এসব নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পারেন, অথচ সাধারণ ইউনিভারসিটির ছাত্রদের ল্যাবোরেটরীর সময় নির্দিষ্ট।

সামার স্কুল

বছরে এক সপ্তা ব্রিটেনের কোন জায়গায় ওপেন ইউনিভারসিটির সামার স্কুল বসে। সব ছাত্রকে এ সময় চাকরিতে ছুটি নিয়ে ওখানে উপস্থিত থাকতে হয়। এ সময় মহা উৎসাহে রাতে দিনে চলে নানান

ক্লাস ও আলোচনা। সারা বছরের লেখাপড়া ও পরিশ্রম তখন যেন ক্লাইমাক্সে উঠে। এবার সশরীরে সাক্ষাৎ হয় ছাত্রের সাথে শিক্ষকের, কোর্স পরিচালকের, পরিকল্পনাকারীর, সহপাঠীর। উঠে সমস্ত সমস্যার কথা। প্রত্যক্ষ সংযোগের সমস্ত অভাব যেন সবাই এক সপ্তার মধ্যে পুষিয়ে নিতে চায়।

ওপেন ইউনিভারসিটির কোর্স নিতে হয় তিন পর্যায়ে। প্রথমে ফাউণ্ডেশন কোর্স : বিজ্ঞান, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, কারিগরি ও কলা—এর যে কোন একটার উপর নেওয়া চলে। এর পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে কিছুটা স্পেশালাইজেশন সম্ভব। আগেই বলা হয়েছে প্রায় ১০ ঘণ্টা খেটে এক একটা ইউনিটের পাঠ শেষ করা যায়। এ রকম ৩২টি ইউনিটের উপর পরীক্ষা পাশ করলে একটা ক্রেডিট হয়। সব মিলে ৬টি ক্রেডিট পেলে সাধারণ স্নাতক ডিগ্রী ও ৯টি ক্রেডিট পেলে অনার্স স্নাতক ডিগ্রি দেওয়া হয়। যেহেতু ওপেন ইউনিভারসিটির প্রায় সব ছাত্র অবসর সময়ে লেখাপড়া করেন, তাই তাঁদেরকে তিন চার বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ধীরে ধীরে ক্রেডিটগুলো যোগাড় করতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

বিভিন্ন বিষয়ে একটি বা দু'টি ইউনিট নিয়ে ওপেন ইউনিভারসিটির বইগুলো প্রকাশিত হয়। খুব নূতন কায়দায় লিখিত এসব বই। সাথে দেওয়া থাকে প্রশ্নমালা ও সমস্যা—যেগুলোর সমাধান বইয়ের পেছনে থাকে। এর থেকে ছাত্ররা নিজেরা নিজেদের অগ্রগতি বুঝতে পারেন। এ ছাড়াও ওপেন ইউনিভারসিটির জন্য বিভিন্ন প্রকাশক বিশেষভাবে কিছু বই প্রকাশ করে থাকেন।

ওপেন ইউনিভারসিটির পরীক্ষা পদ্ধতি নূতন পুরাতনের সমন্বয়ে তৈরি। পত্রপ্রেরিত পাঠ্যের সাথে থাকে প্রশ্নমালা যার উত্তর পাঠিয়ে দিতে হয় ডাকযোগে। এর কিছু অংশ সরাসরি কম্পিউটার কর্তৃক পরীক্ষিত হয়। এছাড়া বছরে শেষে পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত পরীক্ষাও দিতে হয়। এই দুয়ের সমন্বয়ে ক্রেডিট ঠিক করা হয়।

প্রথম বছরে ওপেন ইউনিভারসিটির ছাত্রসংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজার। এর কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংখ্যা হলেন ১৫০ জন। আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে ফুল-টাইম শিক্ষক রয়েছেন এক হাজার আর পার্ট টাইম শিক্ষক আছেন কয়েক হাজার। সংগঠন ও শিক্ষাদান পদ্ধতির মত ওপেন ইউনিভারসিটির কোর্স-গুলোর ধরনধারণে মৌলিকত্বের পরিচয় আছে। পুরানো গতানুগতিকতার চেয়ে আজকের দুনিয়ার প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রেখে এই কোর্স তৈরি হয়। বিশেষ যত্ন ও গবেষণার মাধ্যমে প্রস্তুত এই কোর্সগুলো আবার বহু সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল কলেজের কোর্সকে প্রভাবিত করছে। ডিগ্রি পর্যায়ে লেখাপড়া ছাড়াও এখন ওপেন ইউনিভারসিটি কম্পিউটিং, বাণিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে স্বল্পকাল স্থায়ী কোর্সও দিচ্ছে।

প্রথম বছরের ফলাফলে দেখা গেছে সমস্ত সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও খুব অল্প সংখ্যক ছাত্রই অকৃতকার্য হয়েছে। তবে যে জিনিসটা ওপেন ইউনি-ভারসিটিকে একটু ভাবিয়ে তুলেছে তা হলো, যদিও এর লক্ষ্য ছিল 'শ্রমিক শ্রেণীর লোকজনকে এর মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষায় আকৃষ্ট করা' কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে বেশির ভাগ ছাত্রই এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। এর মধ্যে এককভাবে সব চেয়ে বড় গ্রুপ হলো স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা। মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা তিরিশ ভাগই শিক্ষকতা করেন।

এবার দেখা যাক আমাদের কাছে ওপেন ইউনিভারসিটির কি গুরুত্ব থাকতে পারে। প্রথম কথা হল শিক্ষার সম্পূর্ণ একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও একটা বিরাটাকার এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে আমরা সারা বিশ্বের লোক একে উৎসাহ নিয়ে লক্ষ্য করব। ভাল একটা উচ্চতর স্কুল শিক্ষার পরই বেশির ভাগ লোককে উৎপাদনমূলক বৃত্তিতে পাওয়ার প্রয়োজন আমাদের দেশে ব্রিটেনের চেয়েও বেশি। গতানুগতিকভাবে বি. এ. বা এম. এ. ডিগ্রি লাভ না করে কিছু হবে না এই ধারণা মারাত্মক এবং যেনতেন রূপে ডিগ্রিটা লাভ করার প্রচেষ্টার সহায়ক। তার চেয়ে বরং অবাধ কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত উচ্চ শিক্ষা যেন মানুষ জীবনের পরবর্তী পর্যায়েও নিতে পারে সে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ওপেন ইউনিভারসিটি এদিক দিয়ে আমাদের পথ প্রদর্শক হতে পারে।

স্বাভাবিক কারণেই ওপেন ইউনিভারসিটির হুবহু অনুকরণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। আমাদের সমস্যা কিছু ভিন্ন, তাছাড়া আমাদের সাধ্যও খুবই সীমাবদ্ধ। অন্তত প্রথম বেশ কিছুদিন বাড়ির টেলিভিশন আমাদের এ ধরনের প্রকল্পের প্রাণকেন্দ্র হতে পারবে না। এর অভাব পুরণ করা যেতে পারে রেডিওর গুরুত্ব বাড়িয়ে, পাঠকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়ে যেখানে সন্ধ্যার দিকে একটা সময়ে গিয়ে নিয়মিত ফিল্‌ম বা কেন্দ্রের টেলিভিশনের সামনে (যখন পুরো বাংলাদেশে টেলিভিশন রীলে নেটওয়ার্ক হয়ে যাবে) ক্লাস করতে পারবে। একটি কথা ব্রিটেনেও মেনে নেওয়া হয়েছে, আমাদেরকেও স্বীকার করতে হবে যে ওপেন ইউনিভার্সিটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিকল্প নয়—বা এদের সাথে প্রতিযোগিতায়ও নামছে না। এর প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে, ভিন্ন লোকের জন্য। সর্বজনীন স্কুল-শিক্ষার পর যারা মেধা ও একাডেমিক মনোবৃত্তির পরিচয় দেবে তারা সরাসরি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই শিক্ষালাভ করবে। কিন্তু ওপেন ইউনিভার্সিটি বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য বাতায়ন সব সময় খোলা রাখবে অবাধ, স্বতঃপ্রবৃত্ত উচ্চ শিক্ষার সুযোগের।

এই মুহূর্তে অবশ্য আমাদের ব্যাপক উচ্চশিক্ষা তত প্রয়োজন নেই যতটা প্রয়োজন সর্বজনীন অক্ষর জ্ঞান ও মৌলিক শিক্ষার। তাই এখন আমাদের দরকার, ওপেন স্কুল বা গণ-বিদ্যালয়ের। এখানে ছাত্রসংখ্যা কয়েক হাজার হবে না, হবে কয়েক কোটি। এক্ষেত্রেও ওপেন ইউনিভারসিটির কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্ভাবিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রদত্ত শিক্ষা আমাদের দিকদর্শক হতে পারে। মূল শিক্ষণীয় থাকবে সোজা তিনটি—১। অক্ষর ও হিসাব জ্ঞান, ২। কৃষ্টি জ্ঞান, ৩। জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান। কি ভাবে সহজে ও কার্যকরভাবে এটা গ্রামে গ্রামে কৃষক মজুরের কাছে পৌঁছানো যায় তার জন্য বেশ খানিকটা চিন্তা, গবেষণা ও উদ্ভাবনীর প্রয়োজন। পোস্টার, সহজবোধ্য পুস্তিকা, ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র, রেডিও এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও অসংখ্য ফুল টাইম, পার্ট টাইম, ও স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষকের। আমাদের জাতীয় জীবনে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্য অনেক কিছুর মধ্যে এই গণবিদ্যালয়ের প্রয়োজন অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

ব্রিটেনের ওপেন ইউনিভার্সিটি আরো একটি দিক থেকে আমাদের উপকারে আসতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওপেন ইউনিভার্সিটির কোর্স, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোকে প্রভাবিত করছে। এই ব্যাপারে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোরও অজ্ঞ থাকা বা চিন্তা করে না দেখা উচিত হবে না। তাছাড়া ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রয়োজনে বই, ফিল্‌ম, ভিডিও টেপ, বিশেষ বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ইত্যাদি শিক্ষা-সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। বহু পরিশ্রম ও গবেষণার মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে বলে এদের মান অত্যন্ত উঁচু। ব্যাপকহারে তৈরি হয় বলে এর দাম পড়ে অপেক্ষাকৃত কম—ওপেন ইউনিভার্সিটি এগুলো সাগ্রহে বিক্রয় করতে রাজী আছে। তা ছাড়া বৈদেশিক শিক্ষা-সাহায্যের মধ্যেও এগুলোকে ফেলা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাসে সরকারি মাধ্যম হিসাবে প্রদর্শনের জন্য ওপেন ইউনিভার্সিটির টেলি-ভিশন ক্লাসগুলোর ফিল্‌ম বা টেপ অত্যন্ত উপযোগী হবে। সব-টুকু এক নাগাড়ে দেখাতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রয়োজনমত বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ডেমোনস্ট্রেশন, দলিল বা বক্তব্য ক্লাস শিক্ষক দেখাতে পারেন। দরকারমত ফিল্মগুলো বাংলায় 'ডাব' করে নেওয়া যেতে পারে। প্রত্যক্ষ ডেমোনস্ট্রেশন ছাড়া যেখানে আজকাল অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষা দুরূহ হয়; সেখানে পর্দার উপর এইসব তৈরি ডেমোনস্ট্রেশন খুব সহজে এই অভাব দূর করতে পারবে। তাছাড়া দাম ও কার্যকারিতার দিক দিয়ে ওপেন ইউনিভার্সিটির ল্যাবোরেটরী সরঞ্জাম অনেক ক্ষেত্রে খুবই কাজে আসবে। এসব ব্যাপারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ওপেন ইউনিভার্সিটির সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

মোট কথা, 'ওপেন ইউনিভার্সিটি' নামক যে বিশাল কাণ্ডটি ব্রিটেনে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা করেছে—সে-সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট লোকদের একটা স্পষ্ট ধারণা ও সক্রিয় উৎসাহ থাকা প্রয়োজন।

১৯৭৩

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নীতি

সমস্যাটি বহু পুরানো। কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন ও বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে এবার আমাদের এর মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ধরে নিচ্ছি আমরা অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম করতে চাই। এই যদি ইচ্ছা হয়, তবে যে কোন বাস্তববাদীই দেখবেন শিক্ষার নিম্নতম মান রাখতে হলেও শিগ্‌গির সর্বস্তরের অসংখ্য বইয়ের অনুবাদ ও রচনার কাজ শুরু করতে হবে। কিন্তু এর জন্য কলম ধরার আগেই যে জিনিসটা সব লেখক বা অনুবাদকের সামনে থাকতে হবে তা হল একটা সর্বজনমান্য পরিভাষা তালিকা।

প্রশ্ন উঠবে তালিকা কেন? রচয়িতারা নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে এদ্দিন তো দিব্যি নিজ নিজ পরিভাষা তৈরি করে নিচ্ছিলেন। তাঁদের উপর একটা বিশেষ পরিভাষা চাপিয়ে দেওয়া কেন? এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে বিজ্ঞানের পুরো সংজ্ঞা ও শৃঙ্খলার ভেতর। দৈনন্দিন কাজের ভাষা ও বিজ্ঞানের ভাষার তফাৎটাই হল শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শব্দকে হতে হয় সূক্ষ্ম (precise) ও একক (unique) অর্থবোধক, অথচ সাধারণ কাজের ভাষায় এর কোনটারই এত প্রয়োজন নেই। সাধারণ ভাষাতে শক্তি, বল, জোর, তেজ এর যে কোন একটাকেই রুচি ও মেজাজ অনুসারে ব্যবহার করলে কাজ চলে। কিন্তু বিজ্ঞানের লেখক যদি তা করতে যান তা হলে অর্থের এমন মারামারি লাগে যে তা ভেদ করে পাঠককে বেশী দূর এগুতে হয় না। শুধু তাই নয়, এক একটি অর্থ বোঝাতে বিভিন্ন লেখক যদি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেন তা হলে প্রত্যেক বইয়ের গোড়াতেই প্রত্যেক লেখককে, তাঁর ব্যবহৃত প্রত্যেকটা বৈজ্ঞানিক শব্দের সংজ্ঞা পরিষ্কারভাবে লিখে দিতে হয়। অথচ সবাই জানে বিজ্ঞানের বইয়ের প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। এক বইকে আরেক বইয়ের, আরেক ভিন্ন ক্ষেত্রের, পূর্ব-জ্ঞানের বরাত দিতে হয় এবং সেটা দেবে কোন্ পরি-

ভাষায়? লেখকের কাছে নিজের পরিভাষাকে বেশ স্বাভাবিক মনে হবে, কারণ তিনি নিজের রুচি অনুসারে এটা তৈরি করছেন। কিন্তু পাঠকের কাছে, যিনি আরো দশটা বই থেকে তাঁর বিজ্ঞান-পাঠ সম্পূর্ণ করছেন, এ রকম দশ নিয়মের পরিভাষা রীতিমত বিভীষিকা সৃষ্টি করতে পারে।

অতএব প্রয়োজন সূক্ষ্ম ও একক অর্থবোধক, সর্বজনমান্য পরিভাষার। এর সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা মতবাদ আছে, সাধারণভাবে কোন ভাষায় চর্চার মাধ্যমে যে ভাবে নূতন শব্দ-সম্ভারের সৃষ্টি হয় সেভাবেই এটা হতে পারে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা ও লেখকরা যদি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করেন পরিভাষা তালিকার অপেক্ষা না করে, উপযুক্ত পরিভাষা নিজের থেকেই সৃষ্টি হতে থাকবে। যুক্তিটি মন্দ নয় বটে, তবে মুশকিল হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শব্দ-সম্ভার ছাড়া চর্চাটা শুরুই হতে পারে না। আর এক শব্দ-সম্ভার নিয়ে চর্চা যখন কিছুদূর এগিয়ে যায় তখন ভাষার লালিত্যের খাতিরে শব্দগুলোর পরিবর্তন প্রয়োজন হলেও বিজ্ঞানের খাতিরে পরিবর্তনটি অনেক সময় ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই ইংরেজী, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় প্রথম থেকে ব্যবহৃত বহু বৈজ্ঞানিক শব্দ পরে কিছুটা ভুল অর্থবোধক বা কটমটে মনে হলেও বিজ্ঞানের সুবিধার খাতিরে এদের অপরিবর্তনীয় রাখা হয়েছে। কাজেই ভাষার সাধারণ বিবর্তনের নিয়ম এ ক্ষেত্রে খাটে না। ইংরেজী ভাষায় নূতন শব্দ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় শুধু তখনই প্রবেশ করে যখন একটি নূতন জিনিস বা ধারণা বা নিয়ম বিজ্ঞান জগতে প্রথম আসে। আর প্রবেশের সাথে সাথে এটা বিজ্ঞান সমাজ কর্তৃক সাধারণত নির্দিষ্টকৃত করা হয়ে যায়। বিজ্ঞানের যে সব জিনিস ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত ও সুপরিচিত সেগুলো বাংলায় প্রকাশের ভাষাকে ভবিষ্যতের খোলা বাজারে ছেড়ে না দিয়ে, সূক্ষ্মতা ও এককত্বের খাতিরে গোড়া থেকেই এর নির্দিষ্টকরণ প্রয়োজন। নতুবা এই সুস্থাপিত জিনিসগুলো শিখতেই বাঙালী ছাত্রের অযথা অনেক হয়রানি হবে। তা ছাড়া সময়ের প্রশ্ন আছে। আমাদের বর্তমান প্রয়োজন বিবর্তনের বহু যুগ অপেক্ষা করতে পারে না। বিশেষ করে সুশৃঙ্খল বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ

করার পরিপ্রেক্ষিতে বিবর্তনের যুক্তিটি অনেকটা 'আগে খেলা পরে নিয়মের' সমতুল্য।

কাজেই একটা পথই খোলা থাকে। যত শিগ্‌গির সম্ভব একটা সম্পূর্ণ ও সুপরিকল্পিত পরিভাষা তালিকা প্রণয়ন। যদিও আমাদের বিশেষ পরিস্থিতি ও আকাঙ্ক্ষা এই প্রয়োজনের সৃষ্টি করেছে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা নূতন কিছু নয়। ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে যে শুধু চর্চার ফলে সব পরিভাষা আপনাআপনি সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। ওদেরকেও এক এক সময় বসতে হয়েছে পরিভাষা নির্দিষ্টকরণের কাজে। এমনি একটা প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে। বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে তখনো সেখানে ল্যাটিন ও গ্রীকের অপ্রতিহত আধিপত্য। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্ট চিন্তাধারা তা সহ্য করবে কেন? রসায়নবিদ গীটন দ্য মরভ্যঁ ফরাসী ভাষায় রাসায়নিক পরিভাষা সৃষ্টির একটা সুচিন্তিত রূপরেখা দিলেন। প্রবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আমরাও এমনি রূপরেখা খোঁজার চেষ্টা করব বলে এখানে তাঁর প্রস্তাবিত কয়েকটা মূল নীতি উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না ঃ

(১) যাকে নাম দেওয়া হচ্ছে নামটি তার গুণাগুণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

(২) যে ক্ষেত্রে জিনিসটার গুণাগুণ ভাল জানা নেই সেক্ষেত্রে ভুল অর্থবোধক নামের চেয়ে নিরর্থক নামই শ্রেয়।

(৩) নূতন পরিভাষার ক্ষেত্রে শব্দের মূল সর্বাধিক পরিচিত মৃত ভাষাগুলো থেকে নেয়া উচিত।

(৪) নূতন শব্দগুলো যে চলতি ভাষার মধ্যে সৃষ্টি করা হচ্ছে তার সাথে সেগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ইত্যাদি।

এ ধরনের সুশৃঙ্খল চিন্তা শুধু ফ্রান্সকে নয়, ফরাসী বিপ্লবোত্তর ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশকে নিজের ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় সক্ষম করেছে যার ফলশ্রুতি আমরা স্পষ্টভাবে দেখছি। কাজেই যদিও উল্লেখিত পরিস্থিতি হুবহু আমাদের সাথে এক নয়, তবুও আমাদের এজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যাটির মোকাবেলা করতে হবে।

এই মুহূর্তে সুশৃঙ্খল পরিভাষা সৃষ্টি আরম্ভ করার জন্য আমাদের প্রয়োজন (১) একটি ক্ষমতাসম্পন্ন পরিভাষা পরিষদ. (২) একটা সুষ্ঠু পরিভাষা নীতি এবং সর্বোপরি (৩) পরিভাষা সৃষ্টির কাজকে শিক্ষা সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে তাৎক্ষণিক সক্রিয়তা। পরিষদের গঠন ও কর্মপদ্ধতি এবং পরিভাষা নীতির রূপরেখা সাধারণভাবে বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ সমাজের প্রয়োজন ও মতামতের উপর নির্ভর করবে। তবে এসব বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধে কিছু ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করা যেতে পারে।

স্পষ্টত পরিভাষা পরিষদে দুই রকমের লোকের প্রয়োজন : বিজ্ঞানীর ও ভাষাবিদের। তবে মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে ভাষার সৌন্দর্য বা ব্যাকরণের নির্ভুলতার চেয়েও জানা প্রয়োজন বিজ্ঞানী কি সূক্ষ্ম অর্থে শব্দটাকে প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন এবং এটা কিভাবে করলে বিজ্ঞানের বাকি শৃঙ্খলার সাথে তা সব চেয়ে সহজে খাপ খায়। এদিক থেকে বিজ্ঞানীর প্রয়োজনটিই অগ্রাধিকার পাবে। এটি নির্ণয় করতে সাধারণ ভাবে বিজ্ঞানী হলেই চলবেনা। যে বিশেষ বিভাগের পরিভাষা সেটির সৃষ্টিতে যথাসম্ভব সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা থাকা প্রয়োজন। যে কোন ধরণের অস্পষ্টতাই বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই পরিষদের ভেতরে ও বাইরে সক্রিয় বিজ্ঞানী সমাজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ সমাজের সাথে আদান প্রদানের মাধ্যমে পরিষদ তার কর্মপন্থা নেবে। তবে পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের রচয়িতা ও অনুবাদকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্তর শব্দের সৃজনশীলতা যেন একেবারে বন্ধ হয়ে না যেতে পারে সে জন্য সাধারণপাঠ্য পর্যায়ের রচনায় গৃহীত পরিভাষার পাশাপাশি অন্য পরিভাষা ব্যবহারের সুযোগ থাকবে এবং পরিষদ সেগুলো থেকে প্রয়োজন মত শেখার চেষ্টা করবে।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রশ্ন যখন ওঠে তখন বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের পরিভাষার কথা বাদ দেওয়া যায়না। বিশেষ করে

গণিতের, সংখ্যাতত্ত্বের, দর্শনের পরিভাষার সাথে এর সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। কাজেই এসব বিষয়ের জন্যও পরিভাষা পরিষদ গঠন করে সবগুলো পরিষদকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যে কাজ করতে হবে। আরেকটা প্রয়োজন হল পশ্চিম বাংলার প্রচেষ্টার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা। এতে করে সেখানকার গবেষণা ও পুস্তকাদির সুযোগ আমরা নিতে পারব এবং আমাদেরটার সুযোগ সেখানে নেয়া যাবে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাষার যা তফাত আছে (প্রায় নেই বল্লেই চলে) এর বেশী তফাৎ বাংলা ভাষার দুই পরিভাষায় না থাকাই মঙ্গল। এতে উভয়েই উপকৃত হবে। বর্তমানে আমাদের প্রয়োজনটি বেশী বলে এই ব্যাপারে উদ্যোগটি এখন আমাদের-কেই নিতে হবে।

এবার আসা যাক পরিভাষা নীতির প্রসঙ্গে। এ ব্যাপারে প্রত্যেকটি বিষয়ের এমনকি প্রত্যেকটি শব্দের খুঁটিনাটি সমস্যা আছে। আমরা শুধু সাধারণভাবে কয়েকটি মূল রূপরেখা আলোচনা করতে পারি যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সবগুলো শব্দকে আমরা বাংলা ব্যাকরণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চার ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) তৎসম, (২) তদ্ভব, (৩) দেশী ও (৪) বিদেশী। বর্তমান ক্ষেত্রে অবশ্য শ্রেণীগুলোর সংজ্ঞা একটু ভিন্নভাবে দেয়া হবে। বাংলা ব্যাকরণে তৎসম মানে সংস্কৃতের সম। আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে এর মানে করব বিভিন্ন প্রাচীন ভাষা, বিশেষ করে ল্যাটিন ও গ্রীকের যেসব বিজ্ঞান জগতে প্রচলিত শব্দ আমরা হুবহু বাংলা পরিভাষায় রাখব। অনুরূপভাবে তদ্ভব মানে করব, যেসব শব্দ উপরোক্ত ভাষাগুলো থেকে উদ্ভব হয়েছে বটে, তবে পরিবর্তিত আকারে বাংলা পরিভাষায় আসবে। খাঁটি বাংলা শব্দ ছাড়াও বাংলায় আসা সংস্কৃত বা সংস্কৃত উদ্ভূত সব শব্দকে আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে দেশী শব্দ হিসেবে বিবেচনা করব। এবার শ্রেণীগুলোকে এক একটা করে আলোচনা করা যাক।

(১) তৎসম

দুনিয়াতে নিজ-ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় রত এমন কোন জাতি নেই যারা প্রচুর পরিমাণে এরকম তৎসম শব্দ ব্যবহার করেনা। ইংরেজীতে যদি দেখি তাহলে Atom (গ্রীক), Potential (ল্যাটিন), Chemistry (আরবী) এগুলো যে তৎসম শব্দ তা আজকাল বোঝারই উপায় নেই। এ রকম বহু তৎসম শব্দ বহুকাল ব্যবহারের ফলে আন্তর্জাতিক ভাষার অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন ভাষা ব্যবহারের একটা সুবিধা হল এগুলোর দৈনন্দিন আটপৌরে ব্যবহার নেই বলে কোন বিশেষ অর্থে এককভাবে এদের ব্যবহার করা চলে। কাজেই তৎসম শব্দ ব্যবহারের মধ্যে লজ্জার বা অসঙ্গতির কিছু নেই। শুধু দেখতে হবে এই ব্যবহারটি অপ্রয়োজনীয় বা অসুবিধাজনক হচ্ছে কিনা। এভাবে Oxygenকে 'অম্লজান' করার চেষ্টা না করে অক্সিজেন হিসেবে নেয়াই সুবিধাজনক। কারণ অম্লজানের এমন কোন পরিচিতি আমাদের ভাষায় নেই যার জন্য এ পরিবর্তন সার্থক হবে। কিন্তু Atom-কে পরমাণু' ও Molecule-কে 'অণু' করলে পরিচিতি ও অর্থপূর্ণতার দিক থেকে মন্দ হয় না। কাজেই এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ আমরা নাও রাখতে পারি। প্রাণীবিদ্যার ক্ষেত্রে জীব-জন্তু ও উদ্ভিদের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ বহু যত্নে করা হয়েছে এবং এদের জাতি, গোত্র, নমুনা ও ধর্ম হিসেবে এদেরকে লম্বা লম্বা ল্যাটিন নাম দেয়া হয়েছে যেগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। সব ভাষাভাষীর কাছেই নামগুলো বিদঘুটে; শুধু বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনেই এরা অপরিহার্য, কারণ নামের প্রত্যেকটি অংশই এর জাতিকুল ইত্যাদি বর্ণনা করে। কাজেই প্রাণীবিদ্যার উচ্চতর আলোচনায় আমাদের পক্ষেও ল্যাটিন নামকরণ ব্যবহার করা উচিত। নইলে দু'তিন শতাব্দী ধরে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা যা করেছেন সেই শ্রেণী বিভাগ ও নামকরণের কসরৎ আবার আমাদের করতে বসতে হবে।

তৎসম শব্দের কোনটি রাখা উচিত ও কোনটা উচিত নয় এই ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের সেই সিদ্ধান্ত মেনে চলা উচিত।

(২) তদ্ভব

পরিভাষা সৃষ্টির মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশী কষ্টকর হলেও অনেক সময় প্রাচীন ভাষাগুলো থেকে নূতন শব্দ সৃষ্টি করে নিতে হয়। এটা নানাভাবে করা যেতে পারে। তৎসম শব্দে বাংলা উপসর্গ, প্রত্যয় ব্যবহার করে বা বাংলা শব্দে তৎসম শব্দ যুক্ত করে এটা করা যেতে পারে, যেমন ইলেকট্রন-ত্বরক (electron accelerator), বায়ুচাপ মীটার (Barometer)। অনেক সময় তৎসম শব্দ থেকে এমন শব্দ উদ্ভাবন করা যায় যা হুবহু ভাষাভিত্তিক অনুবাদ নয়, কিছুটা কৃত্রিম উপায়ে শব্দটিকে বাংলায় রূপ দেয়া হয়, যেমন Geometry থেকে জ্যামিতি। তৎসম বিশেষ্যকে ভিত্তি করে বাংলায় নূতন ক্রিয়া বা অন্যান্য শব্দ সৃষ্টি করা যায়। যেমন Ion-কে তৎসম 'আয়ন' রেখে Ionization-কে 'আয়নয়ন ও Ionized-কে 'আয়নিত' করা যেতে পারে। উপরোক্ত সবগুলো উপায়ে তদ্ভব শব্দ তৈরী ভাষাবিদের কাছে সব সময় রুচিকর না হলেও বিজ্ঞানীর কাছে এটা প্রয়োজনীয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে অপরিহার্য।

(৩) দেশী

সাধারণভাবে বাংলায় ব্যবহৃত এবং বিদেশী ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় অনূদিত অনেক শব্দকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা ও এককতার নিয়মকে খুবই কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করতে হবে। যে মুহূর্তে এরকম একটি শব্দকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে সে মুহূর্তে এটা তার সাধারণ আটপৌরে অর্থ হারিয়ে একটা বিশেষ, নির্দিষ্ট অর্থ লাভ করবে এবং সেই অর্থ বোঝাতে শুধু সেই শব্দটাই প্রয়োগ করা চলবে। ভর (mass) আর ওজনের (weight) তফাত সাধারণ জীবনে না থাকলেও বিজ্ঞানে আছে। Force, Power, Energy বিজ্ঞানে হুবহু এক নয়। কাজেই Force যদি 'বল' হয় তবে তা আর 'শক্তি' হতে পারবে না। Energy

বোঝাতে 'শক্তি' বা 'তেজ' এ দু'টার একটাকে বেছে নিতে হবে। দুটাই চালানো যাবে না এক সাথে। কোন শব্দকেই অস্পষ্ট বা অসাবধানভাবে ব্যবহার করা চলবে না।

কষ্টকর দেশী শব্দ তৈরী করার চেয়ে না করাই ভাল। Acid কে 'অম্ল' আর Alkali কে 'ক্ষার' বলা যুক্তিসঙ্গত। তাই বলে Nitrogen-কে 'যবক্ষারজান' বলা হাস্যকর। একই ক্ষেত্রে তৎসম ও দেশী শব্দ পাশাপাশি থাকতে পারে। ইংরেজী বা অন্যান্য বিদেশী পরিভাষায়ও এটা আছে। যেমন মৌলিক পদার্থের তালিকায় ইংরেজীতে Iron, Gold, Tin ব্যবহার করা হয় বটে কিন্তু সংকেপে লেখা হয় যথাক্রমে Fe, Au, ও Sn ; তৎসম শব্দ Ferrum, Aurum ও Stannum থেকে যাদের উৎপত্তি। কাজেই ইংরেজীতে Iron Ore, বটে কিন্তু Ferrous Sulphate বা Ferric Chloride। শেষোক্ত শব্দ দু'টা Iron থেকে বের না করাতে ইংরেজীতে কোন অসুবিধা হয়নি। বাংলাতেও আমরা লোহা, সোনা বা টিন বলে সংকেতে আন্তর্জাতিক Fe, Au ও Sn রাখতে পারি এবং ফেরাস সালফেট ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি। তা যদি না করি তা হলে পর্বত প্রমাণ সমস্যা দেখা দেবে।

শব্দ সৃষ্টি ও ব্যবহার করার সময় ব্যাকরণের অনুশাসন সব সময় মানা সম্ভব হয় না। যেমন 'অনুবীক্ষণ' যদিও একটা কাজ একে Microscope যন্ত্রটার নাম হিসেবেই ব্যবহার করা যেতে পারে। সব সময় 'যন্ত্র' শব্দটা পাশে না থাকলেও ভুল বুঝাবুঝির কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ শব্দের মিতব্যয়িতার (বিজ্ঞানে এটা প্রয়োজন) খাতিরে 'যন্ত্র'-টা না থাকাই ভাল। শব্দের মিতব্যয়িতার কারণেই কোন বিশেষ ক্ষেত্রের সম্পর্ক স্মরণ না করালে চলতে পারে। যেমন বিদ্যুতের আলোচনায় Current অর্থে 'প্রবাহ' বল্লেই চলবে, বিদ্যুত প্রবাহ বলার দরকার নেই। অন্য কিছুর প্রবাহ এর মধ্যে আসলে সেটাই বরং বলে দিতে হবে।

দেশী শব্দ সৃষ্টি করার সময় যথাসম্ভব কিছু কিছু নিয়ম বাঁধার চেষ্টা করে সেই নিয়ম অনুসারেই শব্দগুলো তৈরী করা উচিত। এতে গোষ্ঠীবদ্ধ নূতন শব্দ তৈরী করা যেমন সহজ হবে, পরিভাষা এবং এর বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু আয়ত্ত করাও সহজ হবে। যেমন Symmetry, Symmetric, Assymetric, Antisymmetric এই শব্দ ক'টাকে যথাক্রমে সুসমতা, সুসম, অসুসম ও বিসুসম করা যেতে পারে। শেষোক্ত শব্দ দুটো হয়ত খুব ব্যাকরণ সম্মত বা শ্রুতিমধুর হল না। কিন্তু এতে কাছাকাছি অথচ খুবই ভিন্নার্থক শব্দগুলোর বেশকমটুকু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আরো বড় কথা এখানে 'অ' উপসর্গটা না-অর্থে এবং 'বি' উপসর্গটা বিপরীত অর্থে নিয়ে একটা নিয়ম সৃষ্টি করা যায়। এই নিয়ম অনুসারে Parallel, Non-Parallel ও Antiparallel হবে যথাক্রমে সমান্তরাল, অসমান্তরাল ও বিসমান্তরাল। Particle ও Antiparticle হবে কণিকা ও বিকণিকা। আরেকটা উদাহরণ নেয়া যাক। Ultraviolet-কে কেউ লিখেছেন 'বেগুনী পারের আলো' আর কেউ 'অতিবেগুনী'। শেষোক্ত শব্দটার একটা গুণ হচ্ছে মিতব্যয়িতা। আরেকটা গুণ হচ্ছে এতে Ultra অর্থে 'অতি' টাকে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে, যা অন্যান্য আরো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। যেমন Ultra high vacuum = অত্যুচ্চ শূন্য।

অনেক সময় খুব সাধারণ ও বহুল প্রচলিত একটা অর্থ বোঝাতে গিয়ে আমাদেরকে অপ্রস্তুত হতে হয়। যেমন Study, Experiment, Examination এর যে কোনটা বোঝাতেই আমরা শুধু পরীক্ষা ব্যবহার করতে পারি। অথচ এর প্রত্যেকটির জন্য আলাদা শব্দ দরকার। এসব শব্দ বের করে তার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে হবে। 'পরীক্ষা' যদি এর একটাকে বোঝায় 'নিরীক্ষা' আরেকটাকে বোঝাতে পারে ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, দেশী শব্দকে যত সহজ ও তৈরী মাল বলে মনে হয় আসলে এটা তা নয়। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে প্রত্যেকটি শব্দকে, শব্দ গোষ্ঠীকে এবং নিয়মকে ঢেলে তৈরী করতে হবে। আর এটাই সুশৃঙ্খলভাবে করার দায়িত্ব বর্তাবে পরিভাষা পরিষদের উপর।

(৪) বিদেশী

প্রচলিত ও আন্তর্জাতিক বিদেশী শব্দ গ্রহণ করার ব্যাপারে সব গোঁড়ামিই ত্যাগ করতে হবে। আমাদের ভাষায় ও দুনিয়ার সব জীবন্ত ভাষায় সব সময় কিছু কিছু বিদেশী শব্দ আন্তর্জাতিকত্ব লাভ করে ঢুকে পড়ছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কথাটা বহুগুণে বেশী সত্য। এগুলোকে বেঁটিয়ে বিদায় দেয়ার চেষ্টা শুধু অনুচিত নয়, বিপজ্জনকও বটে। বিশেষ করে উচ্চতর বিজ্ঞান ও গণিতের অনেকগুলো জিনিস সাধারণ জীবনে ও ভাষায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এগুলোকে সংজ্ঞার মারফত নির্দিষ্ট করতে হয়। এ ক্ষেত্রে নূতন বাংলা শব্দ আন্তর্জাতিক-ভাবে প্রচলিত বিদেশী শব্দের মতই অপরিচিত হবে। কাজেই বিদেশী শব্দ-গুলো রেখে দেয়াই সুবিধাজনক। যেমন, 'কোয়ার্ক', 'ভেক্টর,' 'পালসার' প্রভৃতি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বের করতে অভিধান ঘেঁটে কি লাভ?

বিদেশী শব্দ গ্রহণের ব্যাপারে নিয়মটা হওয়ার উচিত এরকম: সাধারণভাবে পরিচিত বিদেশী শব্দের ব্যবহার ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই যদি না আরো পরিচিত ও অর্থব্যঞ্জক বাংলা শব্দ পাওয়া যায়। ক্যামেরাকে 'আলোক চিত্রক' বা লেন্সকে 'পরকলা' করার চেষ্টা না করাই ভাল। তবে photo synthesis-কে সালোক সংশ্লেষণ করতে আপত্তি নেই; কারণ ইংরেজী শব্দটা এমন কিছু সহজ বা সাধারণভাবে পরিচিত নয়, অথচ বাংলা শব্দটির অর্থব্যঞ্জকতা তার সপক্ষে যায়। তাছাড়া অন্যত্র photo উপসর্গের বদলে আমরা যদি 'আলোক' ব্যবহার করি আর analysis ও synthesis-কে সব সময় যথাক্রমে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ বলি তা হলে এটাই সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

সব শেষে আসা যাক গাণিতিক ও অন্যান্য চিহ্নের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানের, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা, কারিগরি ও রসায়নের যে কোন রচনাতে গাণিতিক ও অন্যান্য সাংকেতিক ভাষার দোর্দণ্ড প্রতাপ। এক কথায় বিজ্ঞানের ভাষাই হল গণিত আর এর সৌন্দর্য সাংকেতিক মিতব্যয়িতার মধ্যে। পদার্থবিদ্যার অনেক বিষয় একটি বাক্য না লিখেও শুধু মাত্র

গণিত, সংকেত ও রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করা চলে। আর এই গাণিতিক, সাংকেতিক ও রেখাচৈত্রিক ভাষার মস্ত বড় সুবিধা হল এটা সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক। বহু কষ্টে, বহু যত্নে এই আন্তর্জাতিক সার্বজনমান্য ভাষা গড়ে উঠেছে। এটা হুবহু গ্রহণ না করে এর স্বদেশীকরণের চেষ্টা করলে আমরা এমন কাজে হাত দেব যা আর কেউ চেষ্টা করেনি, খোদ জাপানীরাও না, যাঁরা প্রথম থেকেই নিজের ভাষায় বিজ্ঞানের চমৎকার চর্চা করে আসছেন। এই কারণে বর্তমান প্রবন্ধের প্রস্তাব হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সংখ্যার জন্য 1. 2. 3 ইত্যাদি (আরবী-ভারতীয় সংখ্যাপ্রণালী আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেভাবে লেখা হয়) এবং গাণিতিক ও অন্যান্য চিহ্নের জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে ব্যবহৃত রোমান বা গ্রীক অক্ষর ব্যবহার করা। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত না লিখে শুধু একটি উদাহরণের মাধ্যমে প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বিদ্যুতের ওহ্‌মের নিয়মটি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

ওহ্‌মের নিয়ম বলে $\quad$ প্রবাহ $= \frac{\text{চাপ}}{\text{বাধা}}$ $\quad$ অর্থাৎ, $I = \frac{E}{R}$

এই প্রস্তাবের সুবিধা অসুবিধাগুলো এবার আলোচনা করা যাক। সুবিধাগুলো হলো : (১) এতে গাণিতিক ও অন্যান্য সাংকেতিক দিকটা, যেমন রাসায়নিক ফর্মুলা, সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক থেকে যায়। এর ফলে বিদেশী বই অনুবাদ করার কাজ অনেকগুণে সহজ হয়ে যায়। উচ্চ স্তরের ছাত্রদের পক্ষে বিদেশী বই বা জার্নাল অনেক বেশী সহজে পড়া সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর বিজ্ঞানের বেশীর ভাগ রচনাই, তা জাপানী, রাশিয়ান বা ইংরেজী যে জার্নালেই থাকুকনা কেন, সবার কাছে বেশ কিছুটা বোধগম্য হয়, কারণ তা আন্তর্জাতিক গণিতের বা অন্যান্য সাংকেতিক ভাষায় লেখা। (২) অন্যথায় বাংলার জন্য সম্পূর্ণ নূতন একটা ব্যাপক সংকেত ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে হবে যার প্রণয়ন, প্রয়োগ ও শিক্ষাদান রীতিমত দুরূহ হবে। (৩) এর ফলে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সব রকম যন্ত্রপাতির সংকেত, Calibration ইত্যাদি সরাসরি পাঠ্যযোগ্য হবে।

সম্ভাব্য অসুবিধাগুলো হতে পারে: (১) এর ফলে পুরো এক সেট নূতন অক্ষর ও সংখ্যা শিখতে এবং ব্যবহার করতে হবে। এর উত্তর হল, যে-কোন অবস্থাতেই আমাদের আন্তর্জাতিক গাণিতিক সংকেত ও গ্রীক অক্ষর আলফা-বীটা ইত্যাদি প্রচুর ব্যবহার করতে হবে। এর সাথে ছাব্বিশটা রোমান অক্ষর ও নয়টা সংখ্যা চিহ্ন যোগ করলে বোঝার উপর শাকের আঁটি বই হবে না। বিশেষ করে অনেক ছাত্র যখন এমনিতেই বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজী ও রোমান অক্ষরের সাথে পরিচিত হবে স্কুলে। (২) সংকেত হিসেবে আদ্যক্ষর ব্যবহারের সুযোগটা আর থাকবেনা। যেমন উপরের ওহ্‌মের নিয়মের উদাহরণে বললাম 'বাধা', সংকেত ব্যবহার করলাম R। উত্তর হলো, এটা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজীর পক্ষেও সত্য। যেমন একই উদাহরণে Resistence-কে আদ্যক্ষর R বল্লেও Current-কে বলা হয় I, যেটা আদ্যক্ষর নয়। যেমনি Iron কে সংকেতে Fe বা Lead কে Pb লেখা হয় শুধু আন্তর্জাতিকতার খাতিরে। আমরাও তা করবনা কেন? (৩) এর ফলে বিজ্ঞানের রচনার চেহারা দেখতে পুরো বাংলার মত দেখাবেনা, বিজাতীয় মনে হবে। উত্তর হল, বিজ্ঞানের ভাষার বৈশিষ্ট্যই এটা। হুবহু কোন একটিমাত্র ভাষার ছাঁচে একে ফেলা অসম্ভব, পুরো ব্যাপারটা খুবই আন্তর্জাতিক। যে ছাত্র বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করেছে নূতন পরিভাষার মাধ্যমে, তার কাছে এটা মোটেই অস্বাভাবিক বা সঙ্গতিহীন বলে মনে হবে না। চিহ্নগুলোকে সে বিজাতীয় বা বেখাপ্পা জিনিস হিসেবে নেবেনা, বরং একটি সুন্দর শৃঙ্খলার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে আপন করে নেবে।

পরিভাষা নীতি সম্বন্ধে উপরের পুরো আলোচনায় একটা রূপরেখা মাত্র দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রচুর চিন্তা, সমালোচনা এবং গবেষণার প্রয়োজন। যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল আর দেরী না করে উপযুক্ত পরিষদের হাতে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া ও পুরো-দমে কাজ শুরু করা।

১৯৭২

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা

বিষয়বস্তুটিকে দুটি আলাদা পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমটিকে বলা যেতে পারে উপলব্ধিপর্ব, দ্বিতীয়টিকে সর্বাত্মক কর্মপর্ব। আরেকভাবে বলতে গেলে প্রথম পর্ব হচ্ছে সমস্যাটির 'উত্তাপন' অবস্থা, দ্বিতীয় পর্ব হলো এর 'ফুটন্ত' অবস্থা। একের গুরুত্ব ঐতিহাসিক, অন্যের সাম্প্রতিক। এই প্রবন্ধের জন্য উভয় পর্বই প্রাসঙ্গিক। দুটা পর্ব আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করব।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার কথা যখন বলি তখন আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত বিজ্ঞান চর্চা বলতে কি বোঝাচ্ছি। বিজ্ঞান চর্চার মূল কথা গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানে মৌলিক সংযোজন এবং তার প্রায়োগিক উপযোজন। এটি করতে গিয়ে দরকার হয় বিজ্ঞানের সুশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থার। তাছাড়া সাধারণভাবে বিজ্ঞানকে মানুষের মননের ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করাটাও প্রয়োজন। উল্লিখিত প্রথম পর্বে এর কোনটাই বাংলা ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়নি, হওয়ার চেষ্টাও চলেনি। মৌলিক গবেষণা বাংলা ভাষায় হওয়া দূরে থাক, প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-শিক্ষা, এমনকি সাধারণ শিক্ষায়ও বাংলার স্থান হয় অত্যন্ত নগণ্য। বিজ্ঞানের সিরিয়াস একাডেমিক শিক্ষামাত্রই হয় ইংরেজীর মাধ্যমে। আর একাডেমিক শিক্ষার বাইরে আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের কোন স্থান নেই। এই ব্যবস্থার কৃত্রিমতা ও অসহায়তা সম্বন্ধে গত প্রায় দেড়শত বছর ধরে কিছু সংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তি জনমনে উপলব্ধি জাগাবার চেষ্টা করে এসেছেন। প্রধানত তাঁদের প্রচারণা ও সাধারণপাঠ্য সরস বিজ্ঞান পুস্তক রচনার মাধ্যমেই তাঁরা এটা করেছেন। এটিই উপলব্ধিপর্বের বিষয়বস্তু।

দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ সম্প্রতি অনুভূত সর্বাত্মক কর্মপর্বের সাথে এর তফাত-শুধু মাপের নয়, জাতেরও। গুরুত্ব প্রধানত ঐতিহাসিক হলেও উপলব্ধিপর্বের প্রয়োজনীয়তা আজও একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। কাজেই এরই পটভূমিতে, আমাদের মূল আলোচ্য বলে আমি যা মনে করেছি, সেই কর্মপর্বকে রাখতে হবে।

স্বীকার করতেই হবে যে বাংলাদেশের বিজ্ঞান চর্চার কোন অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য নেই। আদিতে এখানে বিজ্ঞান চর্চা বলে আদৌ কিছু থাকলেও আধুনিককালে এসে আমরা তার সাথে বিশেষ কোন যোগসূত্র রক্ষা করতে পারিনি। তাই বিজ্ঞান বলতে এখন আমরা যা বুঝছি তা এদেশে এসেছে বিদেশী শিক্ষার একটা অনুসঙ্গ হিসেবে, স্বাভাবিকভাবেই বিদেশী ভাষায়। কিন্তু এভাবে বিজ্ঞানের জ্ঞান বিদেশী ভাষার মোড়কে জড়িয়ে হাজির করলে তাতে যে বিজ্ঞানকে আমাদের চিন্তায়, পরিবেশে ও জীবনে পাওয়া যাবেনা তা অনেকের সজাগ মনে তখনি ধরা পড়েছিল—এ শিক্ষা প্রবর্তনের প্রায় সাথে সাথেই।

এই প্রথম উপলব্ধি এমন সব ব্যক্তির মধ্যে দেখা গিয়েছিল যাদের সাথে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আবেগের কোন সম্পর্ক থাকতে পারেনা। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু প্রথম প্রবেশ করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শ্রীরামপুরের খ্রীস্টান মিশনারীদের চেষ্টায়। প্রধানত মিশনের কাজে সাধারণ্যে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে বাস্তববাদী হওয়ার দরুণই তাঁদের মধ্যে এই চেতনা জন্ম নিতে পেরেছিল। যদ্দুর জানা যায় বাংলায় প্রথম বিজ্ঞান গ্রন্থের নাম 'জ্যোতিষ'—শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেসে ১৮১৫ সালে মুদ্রিত। ১৮২৫ সালে উইলিয়ম ইয়েট্‌স 'পদার্থবিদ্যাসার' নামক একখানা বই বাংলায় লেখেন। তার পরপরই বের হয় 'কিমিয়া বিদ্যাসার' নামক রসায়নের বই। ভাবতে অবাক লাগে বাংলায় বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকার প্রচলনও হয়েছিল ঐ সেই যুগে বাংলা গদ্যের যখন নিতান্ত শৈশব। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ কর্তৃক ১৮১৮ সালে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' নামক পত্রিকাতেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক নিয়মিত আলোচনার সূত্রপাত হয়। এককভাবে বিজ্ঞানবিষয়ে প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত

হয় কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে ১৮২২ সালে। লেখাগুলোর বেশীর ভাগ অনুবাদ; অনুবাদ করতেন ডব্লিউ. এইচ. পিয়ার্স। বিষয়বস্তু অনুসারে পত্রিকাটিকে এক এক সংখ্যা এক এক নামে ডাকা হত। পরপর কয়েক সংখ্যা বিভিন্ন পশুর বৈজ্ঞানিক পরিচয় প্রদানই এর বিষয়বস্তু হওয়াতে শেষে এর নাম দাঁড়িয়ে যায় 'পশ্বাবলী'।

দু একটি বিচ্ছিন্ন পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ ছাড়াও কিছু ছোট ছোট প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগও সেই প্রথম যুগের প্রচেষ্টায় দেখা গেছে। ১৮২৮ সালে 'বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয় এবং তার উদ্যোগে 'বিজ্ঞান সেবধি' নামক গ্রন্থ পনেরো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। আজ যে আমরা অনুবাদ ব্যুরো ইত্যাদি স্থাপনের কথা বলি এ প্রয়োজন তখনো অনুভূত হয়েছে। এর বহু পরে ১৮৫১ সালে Vernacular Literary Society নামে আরেকটি সমিতি স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যতম স্থাপয়িতা হড্‌সন প্র্যাট যা লিখেছেন তা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জবানীতে নিম্নরূপ :

'বাঙলার অধিবাসীদিগকে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে বুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রখরতর করা কর্তব্য। ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠলিপ্‌সার সৃষ্টি করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানব শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে।...এই সমিতিকে এই কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।'

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিগত সাহায্য ছাড়াও সরকার মাসিক ১৫০ টাকা দিয়ে সমিতিকে সাহায্য করত। এই সমিতির কাজের ফলাফলও লক্ষ্যণীয়। সতেরোখানি পুস্তক প্রকাশের পর এটা এই সিদ্ধান্তে আসে যে গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এদেশের পাঠকসাধারণের কাছে অধিকতর প্রিয়, অন্য কোন রকম পুস্তক এখানে চলবে না। এ ধরনের

তথ্য থেকে দেখা যায় তৎকালীন উদ্যোগ ছিল প্রধানত সাধারণ্যে বিজ্ঞানের প্রচারের উদ্দেশ্যে। তারও আয়োজন ও সাফল্য ছিল খুব সীমিত। একাডেমিক বিজ্ঞানশিক্ষায় বাংলা ব্যবহার তখনো অচিন্তনীয় ছিল। এই ব্যাপারে ম্যাকলের প্রবর্তিত ভাষানীতি তখনকার মত সব কিছু বেঁধে দিয়েছিল।

পরবর্তী পর্যায়ে বিষয়টির দিকে মনোনিবেশ করলেন বাংলা ভাষার সেরা কয়েকজন সাহিত্যিক ও কয়েকজন শক্তিশালী লেখক। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত খ্যাতিমান ব্যক্তিরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের জন্য জোরালো মত প্রকাশ করলেন। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষায় যে শেষ পর্যন্ত আমাদের নিজেদের বিজ্ঞান গড়ে উঠবেনা এই উপলব্ধি থেকে তাঁরা বাংলায় বিজ্ঞানের উপর লেখাকে একটা জাতীয় কর্তব্য হিসাবে মনে করেছেন। তাঁদের যোগ্য হাতে পড়ে অনেক বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা বাংলা সাহিত্যের উত্তম নিদর্শনে পরিণত হলো। এমন কি রবীন্দ্রনাথও শেষ জীবনে বিজ্ঞানবিষয়ে 'বিশ্ব পরিচয়' নামক বই লিখলেন। এই বই লেখার কৈফিয়ত হিসাবে তিনি এর ভূমিকায় যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য :

'বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলো কেবলই ঝরে ঝরে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীব-ধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে অ তার্থ করে রেখেছে।

'আমাদের মতো আনাড়ি এই অভাব অল্প মাত্র দূর করার চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হলে তারাই সবচেয়ে কৌতুক অনুভব করবে যারা আমারই মতো আনাড়ির দলে। কিন্তু আমার তরফে সামান্য কিছু বলবার আছে। শিশুর প্রতি মায়ের ঔৎসুক্য আছে কিন্তু ডাক্তারের মতো তার বিদ্যা

১নই। এই বিদ্যাটি সে ধার করে নিতে পারে, কিন্তু ঔৎসুক্য ধার করা চলে না। এই ঔৎসুক্য শুশ্রূষায় যে রস যোগায় সেটা অবহেলা করার জিনিস নয়।'

মনে হয় এটা ছিল অন্যান্য লেখকদেরও মনের কথা। ধার করা বিদ্যার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করলেও সেটা তারা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন এর সাথে মাতৃভাষার মাধ্যমে ঔৎসুক্যটুকু যোগ করে দিয়ে এতে অন্তত কিছুটা প্রাণ সঞ্চার করতে।

বেশীর ভাগ লেখকই পেশায় বিজ্ঞানী ছিলেন না। অনেকে তেমন কোন বিজ্ঞানশিক্ষাও পাননি। এঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের শুধু নিজেদের বৈজ্ঞানিক পটভূমি ছিল। জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা এ প্রসঙ্গে বেশী উল্লেখযোগ্য। ভাষার লালিত্য, তথ্যের নির্ভুলতা, বক্তব্যের সুস্পষ্টতা ও নিজেদের বিজ্ঞানমনের ছাপ এ-সবের সমন্বয় ঘটাতে এঁদের লেখাই সব চেয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে রামেন্দ্রসুন্দর তো বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে রীতিমত এক জোয়ার নিয়ে এলেন। বলাবাহুল্য এঁদের বিজ্ঞানশিক্ষা ও সাধনা আগাগোড়া ইংরেজীতেই হয়েছিল। পেশাগত জীবনে সে বিষয়ে তাঁরা বেশী কিছু করে উঠতে পারেননি তৎকালীন বাধা অতিক্রম করে। এই ব্যাপারে এক ধরনের দ্বৈততা তাঁরা যেন মেনে নিয়েছিলেন। বাংলা ১৩১৫ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন মূল সভাপতি। এতে তিনি সভাপতির ভাষণ দেন 'বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান' এই বিষয়ের উপর। এই ভাষণটি নানা কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভাষণের এক জায়গায় তিনি বলেছেন :

'জাপানীরা জার্মানী ও রুশিয়ার ন্যায় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাতৃভাষায় প্রচার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ মৌলিক গবেষণাসমূহ ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানের নানাবিধ মূলতত্ত্ব প্রচার হইতে পারে এজন্য মাতৃভাষা অবলম্বন করেছিলেন।

…সমস্ত বিজ্ঞান জগতে একই পরিভাষা হইলে যে কতদূর সুবিধা হয় তাহা নির্ণয় করা যায় না। জাপানীরা এই সুবিধাটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন : আমাদের তাহাই অবলম্বনীয়।'

এর থেকে দেখা যায় প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত আপোসহীন সংগ্রামীও বিজ্ঞানের চর্চা ও সাধারণ্যে তার প্রচারের ভাষার মধ্যে একটা দ্বৈততাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই দ্বৈততা বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসছে। ইতিমধ্যে জাপান এটা ছেড়ে জাপানী ভাষাকেই সর্বস্তরে বিজ্ঞান চর্চার একমাত্র মাধ্যম করেছে। আমাদেরও তা করার সময় হয়েছে।

এই পর্বের আধুনিকতর পর্যায়ে এসে আমরা অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখি। এতে দেখি ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফলে কোথাও কোথাও উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনেও বাংলার ছিটেফোঁটা প্রবেশ করেছে। এর কারণও ছিল। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সবটুকুই আর আমাদের জন্য ধার করা বিদ্যা রইল না। বিশ্ববিজ্ঞানে এদেশের দু'একটি অবদানও সংযোজিত হতে শুরু করেছে এখন। জগদীশ বসু, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, সি. ভি. রমন, প্রশান্ত মহলানবীশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে বিজ্ঞানের কিছু কিছু দেশজ রূপও দেখা যেতে আরম্ভ করল। কলকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন বিজ্ঞানে বিশ্বখ্যাত মৌলিক সংযোজন সম্ভব হলো, একমাত্র তখনই বিজ্ঞানীদের ও অন্যান্য সবার আত্মপ্রত্যয় জন্মালো—হয়তো বা আমাদের ভাষাতেই বিজ্ঞানের সত্যিকার চর্চা সম্ভব। বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও কিছু কিছু চেষ্টা শুরু করলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই সম্বন্ধে তাঁর এককালের সহকর্মী কাজী মোতাহের হোসেন লিখেছেন,

'দৃশ্যতঃ এগুলি খুব দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আতক্রম করিবার আহ্বান। কিন্তু ১৯৩৬/৩৭ সালের দিকেই খ্যাতনামা অধ্যাপক সত্যেন বসু মহাশয়ের সমর্থনে (আইনতঃ তাঁহার যোগ সাজশে) বেআইনীভাবে বাংলা ভাষায় পদার্থবিদ্যা পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম বি, এ ও এম, এ

ক্লাশে। তাহার কিছুদিন পরে, বোধ হয় ১৯৪৩/৪৪ এর দিকে বসু মহাশয় সভাপতি হিসাবে নিখিল ভারত বিজ্ঞান সম্মেলনে ঝলকবাদ (Quantum Theory) সম্বন্ধে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহার বাংলা তর্জমা করিয়া প্রবাসী পত্রিকায় ছাপানো হইয়াছিল। এই সব কারণে আমার তখনই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এবং সে প্রত্যয় আরো দৃঢ়তর হইয়াছে—যে বাংলা ভাষা আর 'মূঢ়-মূক মুখে'র ভাষা নাই···।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কাজী সাহেব যেভাবে পদার্থবিদ্যা পড়াবার কথা বলেছেন তা পুরাপুরি বাংলায় পড়ানো নয়, ক্লাশে যদ্দুর সম্ভব বাংলায় বুঝিয়ে দেয়া মাত্র। বই ইংরেজীতে লেখা, ছাত্রদেরকেও ইংরেজীতেই লিখতে হবে, বাংলায় বোঝাতে গিয়েও প্রায় সবগুলো বৈজ্ঞানিক শব্দকে ইংরেজীতেই বলতে হচ্ছে। তবুও সেযুগে এটুকু করতেই যথেষ্ট সাহসের দরকার ছিল। আর আজ এতদিন পরেও আমরা বড়জোর এইই করতে পারি, তার বেশী নয়। সত্যেন বসুর মত একদিকে ক্ষমতাবান বিজ্ঞানী ও অন্যদিকে সমাজ সচেতন শিক্ষাবিদের পক্ষে সম্ভব ছিল এ ধরনের প্রচেষ্টা নেয়ার, ছাত্রদের কাজের সুবিধা হবে বলে প্র্যাকটিকালের বই বাংলায় লিখিয়ে ব্যবহার করতে দেয়ার।

সেকালে যেটা সম্ভব হয়নি, বাংলার সেই সর্বব্যাপী ব্যবহারের স্বপ্ন অন্তত ভবিষ্যতে যাতে সার্থক হতে পারে সেজন্য সত্যেন বসু প্রমুখ উৎসাহীরা বিজ্ঞানের সিরিয়াস পত্রিকা বের করেছেন বাংলায়—প্রথমে ঢাকা থেকে 'বিজ্ঞান পরিচয়', পরে কলকাতা থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'। এই উদ্দেশ্যে স্থাপন করেছেন কলকাতায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। সত্যেন বসুর মত বিজ্ঞানী যখন উক্তি করেন 'যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান জানেন না,' তখন তা বিশ্বাসযোগ্য হয় বৈকি। সাথীদের একজন একবার আচার্য বসুকে বলেছিলেন, 'যেদিন দেখব বাংলা ভাষায় মৌলিক গবেষণাপত্র রচিত হচ্ছে সেদিন বুঝব মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সার্থক হয়েছে'। সত্যেন বসুর জেদ চাপল এটা তিনি সম্ভব করবেন। ১৯৬০ সনে 'রাজশেখর বসু সংখ্যা' নাম দিয়ে

তিনি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন যাতে কেবল মৌলিক গবেষণানিবন্ধ ছাপানো হয়েছিল। বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এতে তাঁদের মৌলিক গবেষণাপত্র দেন বাংলায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাজশেখর বসু শুধু পরশুরাম ছদ্মনামে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসসাহিত্যিক ছিলেন না, একজন উঁচুদরের বিজ্ঞানব্রতীও ছিলেন।

অবশ্য স্বীকার করতে হবে পথিকৃৎ হিসেবে অসীম মূল্য থাকলেও হঠাৎ উচ্চতর বিজ্ঞানকে এভাবে বাংলায় লেখার চেষ্টার মধ্যে বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা থাকতে বাধ্য। নীচের থেকে ধাপে ধাপে উপর পর্যন্ত বিজ্ঞান একটি সুগ্রথিত শৃঙ্খলা। বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষার বুনিয়াদ নীচের দিকে সর্বস্তরে না থাকলে উপরের দিকে এর প্রচেষ্টা অর্থহীন ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী কালের বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের একটা প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। একসময় বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণার পর যে এম. এস. সি থিসিস্‌গুলো ছাত্ররা করে, তাদের দিয়ে সেগুলোর বাংলা অনুবাদ করিয়ে নেয়া হবে। ফলস্বরূপ যা পাওয়া গেল তা নৈরাশ্যজনক। বহু অনুবাদক স্বীকার করেছিলেন যে নিজের থিসিস নিজে বোঝাই মুশকিল হয়েছে অন্য বিশেষজ্ঞের কথা বাদই দিলাম। প্রস্তুতি ও পটভূমি ছাড়া এ ধরনের কাজে নামলে এর চেয়ে ভাল ফল আশা করা যায়না। উন্নয়ন বোর্ড ভাল কাজ করত যদি থিসিসের সাধারণপাঠ্য একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ রূপই শুধু তাঁরা বাংলায় লেখাতেন।

বাংলায় বিজ্ঞান পাঠ একমাত্র তার কাছেই সহজতর হতে পারে যে এর আগের পাঠটুকুও বাংলায় নিয়েছে। কাজেই একটা সর্বব্যাপ্ত পটভূমিতেই শুধু বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সর্বাত্মক পরিকল্পনা ও কর্মের। তার কথা হবে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায়। আমাদের প্রথম পর্বের একটা সূত্র কিন্তু আজকের দিনেও বর্তমান এবং তার প্রয়োজনীয়তাও অসীম। এটা হলো বাংলায় সাধারণপাঠ্য বিজ্ঞান-সাহিত্য। অতীতের সুসাহিত্যিক

যাঁরা সরস ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ে লিখেছিলেন, তাঁদের আধুনিক উত্তরসূরীরা কমবেশী সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। বাংলাকে যদি বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম করতে হয়, তাহলে বিজ্ঞান-সাহিত্যের এই অবিচ্ছিন্ন সূত্রকে আমাদের কর্মপর্বের স্থায়ী পটভূমি করতে হবে। এখানে পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণ হবে অল্প, পরিভাষার লাগামও হবে শিথিল। এর মাধ্যমে শৈশবে ও কৈশোরে জাগ্রত হবে বিজ্ঞানের প্রথম কৌতূহলগুলো। আবার এর মাধ্যমেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে জাতির বৈজ্ঞানিক মনন ও মেজাজ; শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই যুক্ত হবে বিশাল বৈজ্ঞানিক বিশ্বের সাথে।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রয়োজন মেটাবারই চেষ্টা করছিলেন লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা ও বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ পুস্তিকাগুলো প্রকাশ করিয়ে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় আজকের আয়োজন খুবই কিঞ্চিৎকর তবুও পশ্চিমবঙ্গে অমল দাশগুপ্ত প্রমুখ আর বাংলাদেশে আবদুল্লাহ আল মুতী প্রমুখ লেখকরা যোগ্য হাতে বিজ্ঞানবিষয়ে লিখে যাচ্ছেন। সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের মত উঁচুদরের বিজ্ঞানীও বাংলায় সাধারণপাঠ্য বই লিখেছেন। এদেশে বাংলা একাডেমীর একটা উজ্জ্বল ভূমিকা আছে এ ধরনের বইয়ের প্রকাশনায়। তাছাড়া বিজ্ঞান পত্রিকাগুলোর দান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সত্যেন বসু কর্তৃক স্থাপিত ঢাকার দ্বিমাসিক 'বিজ্ঞান পরিচয়ের' কথা আগেই বলেছি। এতে রবীন্দ্রনাথ প্রফুল্লচন্দ্র রায়—এঁরা লিখেছেন। এই পত্রিকারই উত্তরসূরী ছিল পরবর্তীকালে বিজ্ঞানোন্নয়ন সংস্থা থেকে প্রকাশিত, শাহ ফজলুর রহমান সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'বিজ্ঞান বিচিত্রা'। বর্তমান পত্রিকাগুলোর মধ্যে মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী' সম্প্রতি নিয়মিত প্রকাশনার একাদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণা ইন্‌স্টিউট থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ত্রৈমাসিক 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা'। কিশোরপাঠ্য একখানা পত্রিকাও কিছুদিন আগে পর্যন্ত অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতো, নাম 'টরে টক্কা'। এসব পত্রিকার দিকে খেয়াল করলে একটা জিনিস চোখে পড়ে—তা হলো আর দশটা পত্রিকার তুলনায় এদের জৌলুস কম, আদরও কম, লেখক সংখ্যাও সীমিত। অথচ পত্রিকাগুলো

প্রকাশের একটা উদ্দেশ্যই ছিল ব্যাপক লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আবার আসতে হয় বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষার সর্বব্যাপ্তিতার অভাবে। যাঁরা বিজ্ঞানে উৎসাহী তাঁরা বাংলা মাধ্যমে অভ্যস্ত নন। আবার যাঁরা বাংলা পড়তে চান তাঁরা বিজ্ঞানে উৎসাহী নন।

এমন একটি অতীত ও বর্তমান পটভূমিকায় আমরা আসি দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ কর্মপর্বের আলোচনায়। যদিও আমরা দেখব এর সত্যিকার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে আর এই স্থান কালের মধ্যেই এর পূর্ণ রূপায়ন সম্ভব, তবু এরও সূচনা অতীতে মূলীভূত। ইংরেজ শাসনের শেষ দিকে এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে স্কুলের বিজ্ঞানশিক্ষা বাংলায় দেয়া হবে। উল্লিখিত বাঙ্গালী মনীষীদের সার্বক্ষণিক আন্দোলন যে এ সিদ্ধান্তের পেছনে কাজ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এভাবে বিজ্ঞানের শৃঙ্খলাবদ্ধ পাঠের প্রথম সূত্রপাত হয় স্কুল টেক্স্ট বইতে। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে প্রথম বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরীর কাজে হাত দেয় তৎকালীন Vernacular Text Book Committee। প্রধানত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও যোগেশচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও এই বিষয়ে বেশ কিছু কাজ করেছিল। এসব কর্মসূচীর সহায়তায় বিভিন্ন বিষয়ের স্কুলপাঠ্য পুস্তকের এক ধরনের অভ্যস্ত পরিভাষা ও রচনারীতি গড়ে উঠেছে, যার পরিচয় আমরা যাদবের পাটিগণিত, কে. পি. বসুর বীজগণিত, কুদরত ই খুদার বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্লাসিক স্কুলপাঠ্যে আধুনিককালেও পেয়েছি। বলা বাহুল্য এ সকল প্রচেষ্টা ছিল সীমাবদ্ধ লক্ষ্যের। এর উপযোগিতা ছিল স্কুলপাঠ্যে সীমিত, প্রবেশিকায় যার পরিসমাপ্তি। ফলে এর মধ্যে কোন সুদূরপ্রসারী চিন্তা ছিলনা, ছিলনা পরবর্তী পাঠের সাথে সমন্বয় সাধনের ভাবনা। ভাবখানা ছিল আপাতত কোন রকমে বুঝিয়ে দাও বাংলায়, পরে ইংরেজীতে তো ভালভাবে পড়বে। এই স্তরে বিজ্ঞানের মূল শৃঙ্খলাটি তার পদ্ধতিটি ধরিয়ে দেবার কোন চেষ্টাই হলোনা, ওটা রেখে দেয়া হলো কলেজে ইংরেজীতে পড়ার

জন্য। এমন কি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত্তি হিসেবেও নেয়া হলোনা একে—যে কারণে অনেকে স্কুলে বিজ্ঞান না পড়েই কলেজ থেকে এটা শুরু করত। উল্লেখযোগ্য যে স্কুলে বিজ্ঞান অবশ্য পাঠ্য ছিল না। এই দ্বৈত নীতির মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম হিসেবে বাংলার কোন স্বীকৃতি প্রচ্ছন্নভাবেও ছিল না। অনেকদিন পর্যন্ত দেখা গেছে বাংলায় পড়ানো সত্ত্বেও পরীক্ষার প্রশ্নপত্রখানি ইংরেজীতে রচিত হতো। কিন্তু এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা একেবারে মূল্যহীন নয়। এর মাধ্যমেই ইংরেজীর বরফ কিছুটা গলল। বাংলায় বিজ্ঞানের শৃঙ্খলাবদ্ধ পাঠের প্রথম সূচনা হলো।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর, প্রফুল্ল রায় বা সত্যেন বসুরা যে স্বপ্ন দেখেছেন তা জাতীয়তাবাদের আবেগ প্রসূত নয়। বরং বাস্তবতার কারণে, চিন্তা ও প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুবিধার জন্যই এর স্বপক্ষে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অবশ্য স্বাদেশিকতার আবেগে সৃষ্ট এক ধরনের জোয়ার এসেছিল এ শিক্ষায়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপনের মারফত মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা দেবার কিছু প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থায় এর প্রস্তাত ও ব্যাপকতালাভ সম্ভব ছিলনা যার ফলে একটা সাময়িক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে এটা শেষ হয়েছে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার প্রথম সত্যিকার সুযোগ দেখা দিয়েছে বাংলাদেশে বাঙালী জাতীয়তাবাদের নূতন উন্মেষে, এদেশের সার্বভৌমত্ব লাভ করার ফলে।

ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী পরিবেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনের গণদাবি এদেশে দুর্বার হয়ে উঠেছিল। এই দাবির চাপে পড়ে তৎকালীন সরকারকে অন্তত মুখে একে কতকটা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। কিছু কিছু পদক্ষেপও নেয়া হলো—বাংলা একাডেমী ও পরে বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিষ্ঠা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উচ্চ মাধ্যমিকে ও কিছু কিছু বিষয়ে ডিগ্রী পাসকোর্সে বাংলায় বিজ্ঞানপাঠের সুযোগও

দেয়া হলো। বোঝানো হলো যে ধীরে ধীরে এই ক্ষেত্রে দ্বৈততার অবসানই হচ্ছে প্রকৃত লক্ষ্য। কিন্তু কার্যত তা সম্ভব ছিলনা। আন্তরিকতা না থাকার ফলে উচ্চ মাধ্যমিকে বাংলায় পড়ার সুযোগটা নামমাত্রই হলো। পরিভাষার নৈরাজ্যে ভর্তি এক আধটা বই সম্বল করে যদিও-বা এখানে বাংলায় সম্ভব হলো, কিন্তু ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল বা অনার্স পড়ার কথা চিন্তা করে স্বাভাবিকভাবেই খুব বেশী ছাত্র এদিকে পা বাড়ায়নি। বরং এক ধরনের দ্বৈততা এবার বহু ধরনের দ্বৈততায় পরিণত হলো। ভাল ছেলে ইংরেজীতে পড়ে, খারাপ ছেলে বাংলায় পড়ে, উচ্চাকাঙ্খী ছেলে ইংরেজীতে, আকাঙ্খাহীন ছেলে বাংলায় পড়ে, শহরের ছেলে ইংরেজীতে পড়ে, গ্রামের ছেলে বাংলায় পড়ে—ইত্যাদি কত বিভেদ ঢুকে গেল শিক্ষাব্যবস্থায়! ইতিমধ্যে স্কুলে বিজ্ঞানপাঠের মান উন্নয়ন ঘটেছে; অথচ ভাষার গোলমালের জন্য উচ্চ মাধ্যমিকে বিশেষ রদবদল সম্ভব হলো না। স্কুলের বাংলায় পঠিত জিনিসগুলোরই চর্বিত চর্বন চললো এখানে ইংরেজীতে বা বাংলায়। এভাবে বাংলা এনে লাভের চেয়ে সময়ের অপচয়ই হলো বেশী। বলা বাহুল্য এ অবস্থা অনেকাংশে এখনো বর্তমান।

এর পরিবর্তনের সুযোগ এসেছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অর্জনের পর। সুযোগ এসেছে সর্বাত্মক কর্মপর্বের সূচনার। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম মুহূর্তগুলো ছিল আবেগ ও উত্তেজনার। তারই প্রকাশ হিসেবে সমস্ত জাতীয় প্রকরণের তাৎক্ষণিক কার্যে পরিণতির একটা ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল সবার মনে। অনেকে চেয়েছেন এ মুহূর্ত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ দেয়া হোক, বিজ্ঞানের চর্চা বাংলায় হোক। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে এরকম হুকুমের বিশেষ কোন অর্থ হয়না। প্রস্তুতি ও আনুষঙ্গিক সমস্যার সমাধান ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বড়জোর তাই করতে পারি যা তিরিশের দশকে সত্যেন বসু বা কাজী মোতাহার করেছিলেন। সমস্যা যে আছে তা স্বীকার না করে আবেগের দ্বারা চালিত হলে আমরা

বেশীদূর এগুতে পারবনা। বরং এটি পদে পদে আসল উদ্দেশ্য বিজ্ঞানশিক্ষা ও চর্চাকে বাধা দিয়ে পুরো ব্যাপারটাকেই সংশয়ের সম্মুখীন করবে। এ মুহূর্তে যা দরকার তা হলো বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বাংলার সর্বব্যাপী ব্যবহার সম্বন্ধে একটি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে সর্বাত্মক কর্মপর্ব শুরু করা। সামনে থাকবে একটা ন্যূনতম সময়সীমা।

বাংলাভাষী অঞ্চলগুলোর মধ্যে শুধু বাংলাদেশেরই সুযোগ রয়েছে একেবারে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করার। রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও ভাষার অভিন্নতা এর কারণ। যদিও মাতৃভাষার ব্যাপকতর প্রয়োগে পশ্চিম বঙ্গের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা কোন অংশেই কম নয়, তবুও সেখানে এই পর্ব কদ্দুর যেতে পারে তার একটা সীমা আছে। একটি পর্যায়ে গিয়ে পশ্চিম বঙ্গের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের ছাত্রকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভাবতে হয়। রাজ্যের বাইরে কর্মক্ষেত্র হওয়ার সম্ভাবনা উচ্চতর পর্যায়ে বাংলাকে কম আকর্ষণীয় করে তোলে। এসব কারণেই সত্যেন বসুর মত বরেণ্য বিজ্ঞানীকে তাঁর আজীবন স্বপ্ন বাস্তবায়নের কোন অগ্রগতি না দেখে মনোকষ্ট পেতে হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের বাড়তি সমস্যাগুলো আমাদের নেই। ফলে বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে বিজ্ঞানের যোগ্য বাহন করে তুলতে বাংলাদেশেরই গরজ ও দায়িত্ব অধিক হওয়া উচিত। তবে যেখানেই সম্ভব বাংলাভাষী এই দুই অঞ্চলের প্রচেষ্টায় সমতা ও সমন্বয় রক্ষা করা এবং পরস্পরের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা কর্তব্য। শেষ পর্যন্ত এই দুই অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক-বাংলার মধ্যে তার চেয়ে বেশী পার্থক্য হওয়া উচিত নয় যতখানি পার্থক্য আছে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক-ইংরেজীর মধ্যে।

এরপর আসা যাক সবচেয়ে বড় সমস্যার কথায়—পরিভাষার সমস্যা। অনেকের মতে পরিভাষার কথা নিয়ে শুধু তারাই হৈ চৈ করে যাদের বাংলা প্রচলনের ব্যাপারে আদৌ কোন আগ্রহ নাই। অর্থাৎ পরিভাষা সমস্যাকে পরভাষা চালাবার একটা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মনে হয় বিজ্ঞান চর্চায় বাংলা ব্যবহারের দুই ভিন্ন পর্ব সম্বন্ধে ধারণার

অভাবই এ মনোভাবের জন্ম দিয়েছে। তাঁদের কথা জগদানন্দ রায় আর রবীন্দ্রনাথ যদি পরিভাষার ভাবনা না ভেবে এমন অনবদ্য রচনা লিখতে পারলেন আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষার বেলায় কেন পরিভাষা ছাড়া চলবেনা? তাঁরা ভুলে যান যে উপলব্ধিপর্বে সাধারণপাঠ্য বই লেখা এক কথা আর কর্মপর্বে স্নাতক শ্রেণীতে শৃংখলাবদ্ধ পাঠের জন্য বা গবেষণার ব্যবহার্য বই লেখা অন্য কথা। এ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বিশ্বপরিচয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

'চেষ্টা করেছি ভাষার দিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কি পারিভাষিক চর্ব্য জাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।'

তখন প্রশ্ন আমরা কি তখনো দাঁত উঠার অবস্থা কাটিয়ে চর্ব্য জিনিস চিবিয়ে খাওয়ার অবস্থায় আসিনি? যদি না এসে থাকি তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

পরিভাষা সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা সুপ্রচলিত মত হলো এটা ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষার বিবর্তনের ফলে আপনিই গড়ে উঠবে। রচয়িতারা নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি অনুসারে পরিভাষা তৈরী করে নেবেন। ওর মধ্য থেকে ভাল পরিভাষা বেরিয়ে আসবে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সক্রিয় অনেক ব্যক্তিকেও এ ধরনের মত প্রকাশ করতে দেখা গেছে। যেমন আবদুল্লা আল মুতীর নাম করা যেতে পারে। মনে হয় সাধারণপাঠ্য 'পপুলার' বইয়ের চিন্তাটাই প্রাধান্য পাওয়ায় এ ধরনের মত সৃষ্টি হতে পেরেছে। এ জাতীয় রচনার জন্য কথাটা যে সত্যি তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গোলমাল বাধে শুরু থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞানের শৃঙ্খলাবদ্ধ পাঠ দিতে গেলে।

দৈনন্দিন কাজের ভাষা ও বিজ্ঞানের ভাষার তফাত্ টাই হলো শেষোক্ত ক্ষেত্রে। প্রত্যেকটি শব্দকে হতে হয় সূক্ষ্ম ও একক অর্থবোধক, অথচ সাধারণ কাজের ভাষায় এর কোনটারই তেমন প্রয়োজন নাই। সাধারণ ভাষাতে শক্তি, বল, তেজ, জোর এর কোনটাই রুচি ও মেজাজ অনুসারে

ব্যবহার করলে কাজ চলে। কিন্তু বিজ্ঞানের লেখক যদি তা করতে যান তাহলে অর্থের এমন মারামারি লাগে যে তা ভেদ করে পাঠককে বেশীদূর এগুতে হয়না। শুধু তাই নয় এক একটি অর্থ বোঝাতে বিভিন্ন লেখক যদি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেন তা হলেও গোলমাল বাঁধে। সবাই জানে বিজ্ঞানের বই প্রত্যেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। এক বইকে আরেক বই, আরেক ভিন্ন ক্ষেত্র, পূর্বজ্ঞানের বরাত দিতে হয়: এবং সেটা দেবে কোন্ পরিভাষায়? লেখকের কাছে নিজের পরিভাষাকে বেশ স্বাভাবিক মনে হবে কারণ তিনি নিজে রুচি অনুসারে এটা তৈরী করেছেন। কিন্তু পাঠকের কাছে, যিনি আরো দশটা বই থেকে তাঁর বিজ্ঞানপাঠ সম্পূর্ণ করছেন, এরকম দশ নিয়মে পরিভাষা রীতিমত বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারে।

কাজেই বিজ্ঞানের সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের গোড়াতেই প্রয়োজন একটা সম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত ও সর্বজনমান্য পরিভাষা তালিকা প্রণয়ন। প্রশ্ন উঠতে পারে এতে লেখকের স্বাধীনতা খর্ব হবে; এভাবে নির্ধারিত অনেক পরিভাষা লেখকের মনঃপুত নাও হতে পারে। তার উত্তরে বলা যায় যে এটা ইংরেজী প্রভৃতি পরিভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেখানেও ঐতিহাসিকভাবে চালু এমন সব পরিভাষার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাহা শুধু বেখাপ্পা নয় রীতিমত ভুল অর্থবোধক। তবু বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার কারণে সবাই এদের মেনে নিয়েছে। শব্দের লালিত্যের চেয়ে ব্যবহারের শৃঙ্খলাই বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বেশী প্রয়োজন। দরকার হলে এটুকু মূল্য দিতেই হবে। তাছাড়া পরিভাষা প্রণয়নের সময় সাবধানতা অবলম্বন করলে এই অসুবিধা অনেকখানি ড়ানো এসম্ভব।

পরিভাষা সম্বন্ধে কথা উঠলে অনেকে বলেন প্রচলিত ইংরেজী, ল্যাটিন ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক শব্দ চেখে নিতে হবে। এটা বলেই তাঁরা খালাস পেতে চান, যেন পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারপর আর কোন কথা থাকেনা। এটাতো সত্য যে, বিজ্ঞানবিষয়ক যত শব্দ ইংরেজীতে ব্যবহৃত হয় তার সবকটা এমনকি বেশীর ভাগও যদি হুবহু রেখে দিতে হয়

তাহলে যে বাংলা দাঁড়াবে তাকে বাংলা বলে চালানো মুশকিল হবে। তাছাড়া শুধু রাখলেই তো হলোনা—বাংলায় এসব শব্দ কিভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হবে, এদের বিভিন্ন পদরূপগুলো কি হবে—এসবও ঠিক করতে হবে। 'নাইট্রোজেন'কে 'যবক্ষারজান' করা না হয় নিরর্থক, কিন্তু তাই বলে কি Temperature-কে 'উষ্ণতা' করতে হবে না? Fission-কে ফিশন বলব কি 'বিদারণ' বলব তাতো রীতিমত বিবেচনা সাপেক্ষ। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জিনিস আছে এবং তা চিন্তা ও পরিশ্রমসাধ্য।

আরেকটি চরম মতবাদ মাঝে মাঝে শোনা যায়, তা হলো, সাহিত্যেই হোক আর বিজ্ঞানেই হোক বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। কটমটে সব ল্যাটিন বা ইংরেজী কণ্টকায়িত বাংলা বিজ্ঞানেও চলবেনা, বিশেষ করে যেখানে চেষ্টা করলেই সংস্কৃত ও বাংলা অভিধান ঘাঁটলেই এদের মোটামুটি প্রতিশব্দ বের করা যায়। টেলিফোনকে 'দূরালাপনী' বলে কিছুদিনের জন্য দূর করে রাখতেও তাঁদের আপত্তি নেই। যুক্তি হলো ব্যবহার করতে করতে কানসওয়া হয়ে যাবে; এতে বাংলা ভাষায় একটা শব্দ তো বাড়ল। যদিও বিজ্ঞানী মহলে, অর্থাৎ যাঁদের ব্যবহারের জন্য পরিভাষা তাঁদের কাছে, এ ধরনের 'ইংরেজী হটাও' মতবাদ বিশেষ গুরুত্ব পায়না, তবুও এর একটা আবেগ সঞ্চারকারী ক্ষমতা আছে। কিছুদিন আগে বাংলা একাডেমী আয়োজিত 'বাংলা প্রচলনে অগ্রগতি' সেমিনারে এর প্রকাশ আমরা দেখেছি। একটা কথা খুব সহজে অনেকে ভুলে যান যে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে সব চেয়ে বেশী চিন্তা করতে হবে বিজ্ঞানশিক্ষা ও চর্চার সুবিধার কথা। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে গিয়ে তাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটানো উচিত হবে না।

কোন রকম চরম মতবাদ না নিয়ে এই 'সুবিধার' দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সুনির্দিষ্ট পরিভাষা প্রণয়ন করতে হবে, যদ্দূর সম্ভব একটা নিয়মের মধ্যে থেকে। অনেক শব্দ ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরেজী বা অন্য যে ভাষারই হোক না কেন, হুবহু রেখে দিতে হবে। এগুলো আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের

অঙ্গীভূত, এদের বঙ্গানুবাদ শুধু নিরর্থক নয়, অনেক সময় ক্ষতিকরও বটে। গণিতের সংকেত, বিদেশী আদ্যক্ষরে গঠিত আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত নাম বা চিহ্ন, এমনকি ইংরেজী সংখ্যা, লেখন প্রণালী হুবহু রেখে দেয়া উচিত আন্তর্জাতিকতা ও সুবিধার খাতিরে। জাপান প্রভৃতি যেসব জাতি বহুদিন ধরে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের চমৎকার চর্চা করেছে তাদের কেউ এগুলো বদলায়নি। আমরা যদি বদলাতে চাই তা শুধু চরম গোঁড়ামি হবেনা, প্রায় অসম্ভবও হবে।

এরপরও অসংখ্য শব্দ থাকবে যেগুলোর জন্য হয় মূল বিদেশী শব্দকে পরিবর্তিত আকারে বাংলায় আনতে হবে, নইলে এদের বাংলা প্রতিশব্দ বের করতে হবে। বাংলায় আনার সময় বাংলা ভাষার বাক্য-বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রেখে শব্দগুলোকে বদলে নেবার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন ionization থেকে আয়নায়ন, ionized থেকে আয়নিত। বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি করার সময় মনে রাখতে হবে যে, শব্দটিকে তার আটপৌরে অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিজ্ঞানের প্রয়োজনে শুধু একটি সূক্ষ্ম অর্থ বোঝাতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর জন্য গুরুগম্ভীর, হালকা, সন্ধি-বদ্ধ, তৎসম, তদ্ভব, দেশী প্রভৃতি যে কোন রকম শব্দ প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারা উচিত। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাপার বোঝাবার জন্য কাছাকাছি অর্থের নানান শব্দ প্রয়োজন। দরকার মতো উপসর্গ প্রত্যয়াদি ব্যবহার করে আলাদা আলাদা শব্দ সৃষ্টি করে নিতে হবে। অনেকে শব্দ সৃষ্টিতে সব সময় সহজ বাংলা দাবি করেন। এটি সবদা সম্ভব হয় না। সবাই স্বীকার করবেন যে প্রায় একই অর্থবোধক বিভিন্ন প্রতিশব্দ দিতে খাস বাংলার চেয়ে সংস্কৃতের সুবিধা বেশী। শব্দ সৃষ্টির ব্যাপারে যত সুযোগ খোলা রাখা যায় ততই মঙ্গল। বঙ্কিমচন্দ্র বহুদিন আগে লিখেছেন, ...'সচরাচর আমরা ভাই শব্দই ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে সময়ে সময়ে তদ্‌ব্যবহারে বড় উপকার হয়। "ভ্রাতৃভাব" এবং "ভাইভাব", "ভ্রাতৃত্ব" এবং "ভাইগিরি" এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গলায় বজায় রাখা উচিত।'

বিজ্ঞানের পরিভাষা করতে গিয়েও এ কথা মনে রাখতে হয়। Black-body radiation এর বাংলা কৃষ্ণকায়া বিকিরণ দেখলে কেউ যেন মনে না করেন যে কঠিন শব্দ ব্যবহারের অভ্যাস থেকে এটা করা হয়েছে। 'কায়া' কথাটির বদলে ফস্ করে 'বস্তু' লিখে দিলেই চলবেনা, কারণ পদার্থবিদ্যায় বস্তু শব্দটার অন্য দায়িত্ব আছে, তাই body বোঝাবার ভার কায়াকেই নিতে হয়েছে।

অনেক সময় খুব সাধারণ ও বহুল প্রচলিত একটা অর্থ বোঝাতে গিয়ে আমাদের অপ্রস্তুত হতে হয়। যেমন Study, Experiment, Examination এর যে কোনটা বোঝাতেই আমরা শুধু 'পরীক্ষা' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। অথচ বিজ্ঞানে এর প্রত্যেকটির জন্য আলাদা শব্দ দরকার। কাজেই পরীক্ষার উপর থেকে অর্থের গুরুভার লাঘব করে যদি Study অর্থে 'পরীক্ষা' আর বৈজ্ঞানিক Examination অর্থে 'পরখ করা' লেখা হয় তাহলে আপত্তি ওঠা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে যারা এই পরিভাষা প্রণয়ন করেছেন তাঁদেরকে একই সাথে তিনটা শব্দের কথা মনে রেখে প্রত্যেকটার প্রয়োজন মিটাতে হয়েছে। এরকম অনেক উদাহরণ দেয়া যায়।

সমস্ত নমনীয়তা রেখেও বৈজ্ঞানিক শব্দ সৃষ্টির পেছনে যেখানেই সম্ভব একটা নিয়ম কাজ করা উচিত। শুধুমাত্র সৌন্দর্য বা ঝংকারের দিকে খেয়াল রেখে এলোপাথারি শব্দ তৈরী করে যাওয়া উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাধারণপাঠ্য বইয়ে ultraviolet কে 'বেগুনী পারের আলো' আর infra red, কে করেছেন 'লাল উজানি আলো'। এগুলো সাহিত্যগুণে গুণান্বিত হলেও শৃঙ্খলা ও বৈজ্ঞানিক মিতব্যয়িতার দিক থেকে বর্তমানে ব্যবহৃত 'অতিবেগুনী' ও 'অবলাল'ই ভাল। এতে একটা নিয়মেরও সৃষ্টি হলো। যেমন Ultrasonic-কে 'অতিশাব্দিক' ও infrasonic-কে 'অবশাব্দিক' করা যায়। এমনি এই নিয়মে আরো অনেক শব্দ তৈরী করা যায়।

স্বল্প পরিচিত কিছু কিছু বাংলা শব্দকে প্রয়োজনে ব্যবহারে আনতে

হয়। ইংরেজী Radius শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ চালু আছে 'ব্যাসার্ধ'। অথচ বিজ্ঞানে Diameter বা ব্যাসের চেয়ে Radius বা ব্যাসার্ধ অনেক বেশীবার এবং অনেক বেশীভাবে ব্যবহৃত হয়। এমন অনেক প্রয়োজন আছে যেখানে ব্যাসার্ধ এই উদ্ভূত শব্দটির ব্যবহার অসুবিধাজনক। যেমন radial distance-এর বাংলায় ব্যাসার্ধীয়দূরত্ব ঠিক অর্থবহ নয়। অথচ 'অর' বলে একটা স্বল্পপরিচিত বাংলা শব্দ আছে যা Radius এর সমার্থক। এই ছোট্ট শব্দটি দিয়ে 'অরীয়দূরত্ব' ইত্যাদি সহজে করা যায়। কাজেই এই যুক্তিতে অর ব্যবহার করলে ক্ষেপে যাওয়া উচিত হবে না। অনেক সময় বিশেষ একটা শব্দ কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলে সেখানে সেটা তার সাধারণ মানকে অতিক্রম করে যায়। সেক্ষেত্রে বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা একে 'কয়েন' করে নিতে হয়। 'দশা' শব্দের একটা আটপৌরে মানে সাধারণ ভাষায় আছে। কিন্তু যখন একটা Phase অর্থে বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয় তখন তার সংজ্ঞানির্দিষ্ট মানে যে জানে, এটা শুধু তার কাছেই সঠিক অর্থবহ।

এ সবকিছু থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায়, তা হলো পরিভাষা আপনা-আপনি তৈরী হবার নয়। এর পেছনে প্রচুর চিন্তা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। এর মূল দায়িত্ব বিশেষজ্ঞ-ব্যবহারকারীর, যে এর সূক্ষ্ম প্রয়োজনগুলো বুঝবে। আংশিকভাবে পরিভাষা নির্দিষ্টকরণের চেষ্টা অতীতে কয়েকবার হয়েছে। স্কুলপাঠ্যের প্রয়োজনীয় পরিভাষা সৃষ্টির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চতর পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্য সংসদের তালিকা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে স্বাধীনতা পূর্বকালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কিছু পরিভাষা তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ও আয়োজনের অভাবে উল্লিখিত তালিকাগুলোর বেশীর ভাগ অসম্পূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় না রেখে এগুলো তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া বিশেষ করে উন্নয়ন বোর্ডের তালিকা স্থানবিশেষে পরিভাষা না হয়ে অভিধান বা শব্দকোষের মত হয়ে গেছে। এতদ্-

সত্ত্বেও পথিকৃৎ হিসেবে এসব তালিকার যথেষ্ট মূল্য আছে এবং সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান বইগুলোর রচনায় এগুলো খুবই সাহায্য করেছে।

বর্তমানে বাংলা একাডেমী নূতন প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রেখে পরিভাষা তালিকাগুলোর সংস্কার ও পরিবর্ধনের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। এ কাজটি খুব প্রশংসনীয় এবং আরো আগেই শুরু হওয়া উচিত ছিল। উচ্চতর পর্যায়ের জন্য পরিকল্পিত টেক্সট বইগুলো লিখিত হবার আগেই এ কাজ সম্পন্ন হলে ভাল হয়। তার জন্য প্রয়োজন হলে বইগুলো কিছু দেরীতে বের হলেও ক্ষতি নেই। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিভাষার নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেয়ে বিলম্বই শ্রেয়। বাংলা একাডেমী পরিভাষা প্রণয়নে যে পদ্ধতি অনুসরণ করছে তা মোটের উপর সঠিক। তবে এর কিছুটা উন্নয়ন প্রয়োজন। পরিভাষা প্রণয়নের ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত হয়েছে তাঁরা যেন খুব ব্যাপকভিত্তিতে এই ব্যাপারে উৎসাহী ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ রেখে পরামর্শ নিতে পারেন, তার ব্যবস্থা করে দেয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কিত প্রকাশিত বই, পত্র, পত্রিকা, অন্যান্য তালিকা, অভিধান কোষ ইত্যাদি তাঁদের কাছে সহজলভ্য করা উচিত। নির্দিষ্ট শব্দগুলোর সাথে সাথে প্রয়োজন মত এদের কেন বেছে দেয়া হলো সে সম্পর্কে যদি সংক্ষিপ্ত টীকাও তালিকায় দিয়ে দেয়া হয় তাহলে সম্পাদনার সময় সমালোচকের এবং পরে ব্যবহারকারীর সুবিধা হয়। এসব কাজের জন্য যথেষ্ট সময় দেয়াও প্রয়োজন।

বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ে পরিভাষা তৈরী করার জন্য আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এটা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অনেক সময় একই শব্দ একই অর্থে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন পদার্থবিদ্যায় ব্যবহৃত হয় এরকম অনেক পারিভাষিক শব্দ গণিতে, রসায়নে বা দর্শনে প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে এ সব বিষয়ে একই পরিভাষা হলে ভাল হয়। কাজেই বিভিন্ন কমিটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। যা হোক, যত সুচিন্তিতভাবে যত ব্যাপকভিত্তিতে পরিভাষা নির্দিষ্ট হবে ভবিষ্যতের জন্য ততই মঙ্গল।

তারপরও সময় সময় এই নির্দিষ্ট পরিভাষার এখানে ওখানে অল্প রদবদল সম্ভব হবে। সাধারণপাঠ্য 'পপুলার' রচনায় পরিভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ সব সময় থাকবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, একবার নির্দিষ্ট হয়ে গেলে সেই পরিভাষা অন্তত পাঠ্য-পুস্তকের অনুবাদক বা রচয়িতার জন্য মোটের উপর অবশ্য ব্যবহার্য হওয়া উচিত। এমন কি তালিকার কোন শব্দকে কেউ কম উৎকৃষ্ট মনে করলেও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এটার ব্যবহার করা উচিত। লেখকদের খোলা বাজারে দিয়ে বা হচ্ছে হবে করে পরিভাষা সমস্যার সমাধান হবে না। অনুবাদক, লেখক, পাঠক, ছাত্র সবাই যত শিগ্‌গির পরিভাষার গোলক ধাঁধা থেকে বের হয়ে এসে আসল কাজে হাত দিতে পারবে ততই মঙ্গল। যে কাজে পরিভাষা ব্যবহৃত হবে তার প্রয়োজনটাই অগ্রাধিকার পাবে, লালিত্যের খবরদারির চেয়ে। এতে করে কাজ সহজ ও দ্রুততর হবে. মনও সব সময় খচখচ করবে না সুন্দরতর শব্দের অভাবে।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে অপবাদ আছে—এতে আবেগময় ভাব প্রকাশ করা যায় যত সহজে ও বিভিন্ন ভাবে, কাজের কথা তত নয়। আবেগ ঘেঁষা কাজেই শুধু ব্যবহৃত হয়েছে বলে হয়ত এই অপবাদ। তবে কথাটা অনেকখানি সত্যি। এ সম্পর্কে রাজশেখর বসুর একটা কথার সাথে অনেকে একমত হবেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলা কাগজে আগুন লাগা বা অগ্নিকাণ্ডের খবর লেখা হয় বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলা। জলে ডুবি বা জলমজ্জনকে বলা হয় সলিল সমাধি। 'ব্যর্থ হইল' লিখলে যথেষ্ট হয়না, লেখা হয় 'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল'। বাংলাভাষী স্থানে লেখা হয় বাংলাভাষাভাষী। সরল ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করতে অনেকে পারেন না'।

বিজ্ঞানের আলোচনায় উচ্ছ্বসিত ভাষা বিপত্তি ঘটায়। অনেক সময় এতে তথ্যগত ভুলের এবং ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। অথচ বাংলায় লিখতে গেলে এ উচ্ছ্বাস হরহামেশা ঘটে থাকে। একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ দেয়া যাক। বসু সংখ্যায়নের মূল প্রবন্ধটি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ঃ

'এমনই অসামান্য এর গুরুত্ব যে তার মর্মোদ্ধার করা বর্তমান বিশ্বের দশ বারো জন ব্যক্তির সাধ্যেই কুলোয়।' পদার্থবিদ্যার স্নাতকোত্তর শ্রেণীর মেধাবী ছাত্ররা যে জিনিস অল্প আয়াসে বোঝে তাকে বর্তমান বিশ্বের দশ বারোজনের বেশী ব্যক্তির অবোধ্য বললেই সে জিনিসটাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় তা হয়ত বাংলা রচনারীতিরই ফল; কিন্তু এতে বিজ্ঞান ব্যাহত হয়। একই জায়গায় আরেক রচনায় লেখা হয়েছে: 'বস্তুত দেশকালের সেই অন্তহীন ও ভয়াবহ মহাশূন্য এখনও পূর্ণ বোসন বা বসু-নামা অণু পরমাণুতে এবং বোস গগনে। গত কয়েক যুগ ধরে বোসনরা আমাদের আকাশে বিচরণশীল।'

মহাশূন্য অন্তহীন হতে পারে কিন্তু ভয়াবহ কেন? যেখানে বলা দরকার কণিকা সেখানে অণু-পরমাণু বললে ভুল বলা হয়। অণু ও পরমাণু উভয়ের আলাদা মানে আছে বিজ্ঞানে। বোস গগনটাই বা কি? বোসন সর্বত্রই থাকতে পারে। আকাশে বিচরণশীল বলে মনে হবে যেন এটা মহাজাগতিক কণিকা বা গ্রহাণুর মত কিছু একটা। গত কয়েক যুগই বা কেন? বোসন কি চিরকালই ছিলনা? সবচেয়ে বড় কথা হলো উপরোক্ত উচ্ছ্বাসগুলো বক্তব্যের খাতিরে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। এতে করে শুধু আসল কথাটাকে গুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। বিজ্ঞানের জন্য ভাষার লালিত্যের ততখানি প্রয়োজন নাই যতখানি প্রয়োজন ঋজুতার।

উল্লিখিত আবেগময়তার কারণ অবশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। আমাদের সংস্কৃতি চিরকালই দুই বায়ু চলাচলহীন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ছিল। সাহিত্য চর্চার ভাষা ছিল বাংলা, কিন্তু বিজ্ঞান বা কাজের কথার ভাষা ছিল ইংরেজী। কাজেই যেই ব্যক্তির ইংরেজী প্রকাশভঙ্গী সংযত তিনিই আবার বাংলায় আবেগপ্রবণ। অন্যরকম ব্যবহার ও চর্চা শুরু হলে বাংলার এই অসুবিধা আপনিই ঘুঁচে যাবে। তবে লেখার সময় এ বিষয়ে সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। বক্তব্যের সুস্পষ্টতা ও নির্ভুলতা যেন অন্য সব প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রাজশেখর বসুর পরামর্শটা মূল্যবান: 'যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞানের বই লিখবেন তাঁদের বাগাড়ম্বর পরিহার

করে স্পষ্টতা আর শৃঙ্খলিত যুক্তির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিজ্ঞান-দর্শনের প্রসঙ্গে কবিত্বের ঈষৎ স্পর্শ একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় সার্থক হয়েছে। যাঁরা স্কুল-কলেজের জন্য বিজ্ঞানের বই লিখবেন তাঁদের সে রকম চেষ্টা না করাই ভাল।'

বিজ্ঞান এতকাল বিদেশী ভাষাশ্রয়ী ছিল বলে বাংলাতে আজ যখন আমরা বিজ্ঞানবিষয়ে লিখতে যাই তখনো ইংরেজী প্রকাশনীতির ছাপ থেকে যায়। বাংলা ও ইংরেজী এই দুটি ভাষার প্রত্যেকটিরই স্বকীয় প্রকাশ বৈশিষ্ট্য আছে। একটার প্রকাশভঙ্গী আরেকটার উপর প্রয়োগ করতে গেলে অনর্থ বাধে, এবং অনেক সময় ভাষাকে কৃত্রিম করে তোলে। একটা ছোট উদাহরণ দেয়া যাক। ইংরেজীতে বলা হয় Chemical Socitey of Bangladesh-এর আমরা বাংলা করি 'বাংলাদেশ রসায়ন সমিতি'; তা' না করে ইংরেজীর হুবহু অনুকরণে একে যদি আমরা 'বাংলাদেশের রসায়ন সমিতি' করি সেটা খুব স্বাভাবিক শোনাবে না। বাংলার এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে মনোযোগী না হলে বাংলায় বিজ্ঞানের বই পড়তে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে।

তবে এটাও ঠিক যে ওভাবে ব্যবহৃত হয়নি বলে বিজ্ঞানের ভাষা হবার সব ধরনের নমনীয়তা এখনো বাংলার মধ্যে গড়ে উঠেনি। বহু শর্তসাপেক্ষ জিনিস নিয়ে বাক্য, কিংবা এক বড় বাক্যের মধ্যে ছোট ছোট বিভিন্ন বাক্যের সমন্বয়ে জটিল বাক্য ইত্যাদি বাংলা ভাষায় কিছু বেমানান ঠেকে। অথচ বিজ্ঞানের ভাষায় এদের এড়ানো যায় না। সাহস করে ব্যবহার করতে করতে এসব ব্যাপারে বাংলার নিজস্ব শৈলী আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে। কিছু সময় দেয়া হলে সন্তোষজনক শৈলী এর মধ্য থেকে আমরা বেছে নিতে পারব। অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু একটি রচনা মাতৃভাষায় লিখিত হয়েছে সেহেতু এটি যেকোন লোকের কাছে সহজবোধ্য হতে হবে—যদি তা না হয় তাহলে রচনারীতির দোষে বা লেখকের ক্ষমতার অভাবে। এটি নেহাত অন্যায় আশা। মাতৃভাষায় লিখলেই একটি বিষয়ের জটিলতা উঠে যায় না। পর্যাপ্ত পটভূমির জ্ঞান ছাড়া এটা দুর্বোধ্য হওয়া

অস্বাভাবিক নয়। যাঁরা মনে করেন যে, বিজ্ঞানের গবেষণাপত্রগুলো বাংলায় লিখলে সাথে সাথে সর্বসাধারণের কাছে গবেষণার বিষয়বস্তু জানা হয়ে গেল, তাঁরা ভুল করে থাকেন। এটা শুধু হতে পারে গবেষণাপত্রের একটি সাধারণবোধ্য 'পপুলার' রূপ মাতৃভাষায় লিখলে। সিরিয়াস বিজ্ঞানের আলোচনায় ভাষাকে জোর করে সহজ বা সুললিত করার চেষ্টা করলে তাতে বস্তুগুণের হানি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

আরেকটা বিতর্ক দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো রয়ে গেছে। সেটা হলো সাধু-চলতির বিতর্ক। বাংলা ভাষার অন্যান্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ বিতর্ক বহু আগে ফয়সালা হয়ে গেলেও বিজ্ঞানবিষয়ক বইয়ের বেলায় এটি এখনো চালু আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে চলতি ভাষা নিয়ে অনেকের তুমুল আপত্তি থাকলেও এরপর প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ সহ অনেক যোগ্য লেখকের চেষ্টায় চলতি ভাষা বাংলা সাহিত্যের প্রধান রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু সাহিত্যই নয়, নানা জটিল বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার বাহন হিসাবেও এর উপযুক্ততা অসংখ্যবার প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলা ভাষার আধুনিক গতিটিও এই মুখেই। খুব কম লোকই আজকাল সাধু ভাষায় লেখেন বা ভাষণ দেন। খুব যোগ্য হাতে না পড়লে সাধু ভাষায় লিখিত জিনিস স্বাভাবিক বা কাছের জিনিস বলে আজকাল মনে হয় না। এ রকম অবস্থায় বাংলা একাডেমী বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদেরকে অনুরোধ করে থাকে 'সাধু ভাষায় রচনা বাঞ্ছনীয়'। যেসব পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে তারও প্রায় সবগুলো সাধু ভাষায় রচিত। এটা কেন? এর স্বপক্ষে যে সব যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে সেগুলো আলোচনা করে দেখা যাক।

বলা হয় বিজ্ঞানের জটিল বিষয়সমূহের গুরুগম্ভীর আলোচনা সাধু ভাষায় জমে ভালো। খুব সম্ভব আধুনিক চলতি ভাষার বহুরূপিতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকেই কথাটির জন্ম হয়েছে। আজকাল চলতি ভাষামাত্রই টেকচাঁদী ভাষা নয়। আড্ডার চলতি ভাষা, বক্তৃতার চলতি ভাষা, আর সিরিয়াস প্রবন্ধের চলতি ভাষা—এসব এক জিনিস নয়।

সব ক'টা ব্যবহারের সুযোগ এর মধ্যে রয়েছে। চলতি ভাষা হলেই তৎসম শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, জটিল বাক্য চলবে না এসব ধারণা আজ অচল। বলতে গেলে ক্রিয়ারূপ ও ছোটখাট দু'একটা বিষয় ছাড়া সাধু ভাষার সাথে তার অমিলও বিশেষ নেই। তবুও ইতিহাসের বিপরীত স্রোতে গিয়ে আবার আমাদের সাধু ধরতে হবে কেন ? আমরা কনফারেন্সে বক্তৃতা বা আলোচনা করব চলতি ভাষায়, পপুলার বই লিখব চলতি ভাষায় অথচ পাঠ্যপুস্তক লিখব সাধুভাষায়, ছাত্র ক্লাসে লেকচার শুনবে চলতি ভাষায় অথচ বই পড়বে সাধু ভাষায়—এ ধরণের দ্বৈততা থেকে রক্ষা পাবার জন্যই তো মাতৃভাষায় পড়া।

আরেকটা যুক্তি দেখানো হয় যে স্কুলে ছাত্ররা সাধু ভাষায় পাঠ্যপুস্তক পড়ে; কাজেই সঙ্গতি রাখতে গিয়ে উচ্চতর পর্যায়েও এটা চালাতে হবে। এর উত্তর হলো স্কুলের পাঠ্যে এই ভাষারীতি বদলানোর দরকার ছিল বহু আগে। এখন তা সম্পন্ন করতে হবে। ক্রমর্ধমান হারে দেখা গেছে স্কুলের ছাত্ররা সাধু ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক পড়েও চলতি ভাষায় পরীক্ষার উত্তর করছে। এ থেকে বোঝা যায় তাদের সুবিধা কিসে। ইংরেজ আমলে যখন এই স্কুলপাঠ্যরীতির প্রবর্তন হয়েছিল তখন সেটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এরপর এই ক্লাসিক রীতিতে পরিবর্তন করা হয়নি দরকার সত্ত্বেও।

অনেক সময় গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে বলা হয় যে পাঠ্যপুস্তক যাঁরা লেখেন তাঁদের অধিকাংশ সাধু ভাষার পক্ষপাতী। কাজেই উপায় কি ? এর একটা কারণ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার স্বাভাবিকভাবেই প্রবীণ বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের হাতে রয়েছে। আর তাঁদের অনেকে সাধু ভাষা রাখার ব্যাপারে রক্ষণশীল। লেখকদের কিছুটা অসুবিধা হলেও বৃহত্তর স্বার্থে বিজ্ঞানবিষয়ক যাবতীয় রচনা এখন চলতি ভাষায় লেখা উচিত। পপুলার বইয়ের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ লেখকের যদি নিজস্ব কোন সাধু গদ্যরীতি থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। তবে পাঠ্যপুস্তক সাধু ভাষায় রচিত হলেও অন্য কেউ সহজেই একে

চলতি রূপ দিতে পারে। এই ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর মত প্রতিষ্ঠানের একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য ও প্রগতিবাদী ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।

আমাদের কথিত উপলব্ধিপর্বে সবকিছু ধীর গতিতে নিজ মেজাজে হতে পেরেছে। কিন্তু ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে এসে নানা কারণে আমাদেরকে এক সর্বাত্মক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে হচ্ছে। এ রকম বিরাট আয়োজনের সমস্যা আছে, ঝুঁকিও আছে। যত কথাই বলা হোক, আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানশিক্ষা ও চর্চা মোটের উপর এখনো ইংরেজীতেই চলছে। এই ইংরেজী ব্যবহারের একটা নিজস্ব শৃঙ্খলা আছে, যা কিছু হচ্ছে এই শৃঙ্খলার মধ্যে হচ্ছে। আজ যদি এই প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা ভেঙ্গে দিয়ে একটি নতুন শৃঙ্খলা স্থাপন করতে যাওয়া হয়, তাহলে অনেক জিনিস পরিবর্তন করতে হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে। এ পরিবর্তন সহজ নয়। এতে অন্তত কিছু সময়ের জন্য শিক্ষা ও গবেষণা বিপর্যস্ত হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। ইংরেজীতে অভ্যস্ত সব বিজ্ঞানী ও শিক্ষক রাতারাতি বাংলা ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করবেন না এ আশা করা বা বিজ্ঞান-লাইব্রেরীতে শতকরা প্রায় এক শ' ভাগ বই যেখানে এখনো ইংরেজীতে, সেখানে সব বই হঠাৎ করে বাংলা হয়ে যাবে এমন ধারণা করা অন্যায়। প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা অনেক। যারা এই পরিবর্তন কার্যকরী করবে তাদের কথাই প্রথমে ধরা যাক। এযাবত বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান আর সাথে সাথে বাংলা ভাষার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারক্ষমতা—এ দুয়ের সমন্বয় সীমিত সংখ্যক লোকের মধ্যেই কেবল দেখা গেছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। বিজ্ঞানশিক্ষার কোন পর্যায়ে বাংলা এমনভাবে ব্যবহৃত হয়নি যার ফলে এ সমন্বয় ঘটতে পারে। বিশেষজ্ঞ মানুষ বা টেকনিক্যাল মানুষ বড়জোর গল্প উপন্যাসের বাংলার সাথে এদ্দিন পরিচিত হতেন। তাঁদের চিন্তার ভাষা, কর্মের ভাষা ছিল ইংরেজী। আজ সর্বাত্মক কাজে নামতে গিয়ে এই অসুবিধাটি খুবই বড় হয়ে বাজতে পারে। অথচ বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ছাড়া হাজার ভাষাজ্ঞান নিয়ে এ বিষয়ে কিছু করা যাবে না। আশার কথা হচ্ছে

ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পটভূমিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে বাংলার এই ব্যবহারসম্ভাবনার প্রতি সক্রিয় সচেতনতা মোটামুটি ব্যাপকভাবে আছে। সাবিক পরিবর্তনে যেখানেই সম্ভব, এই তরুণ গোষ্ঠীকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে।

তারপর আসতে হয় পুস্তক প্রকাশনার সমস্যায়। একটা কথা গোড়াতেই আবার জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে সিরিয়াস বিজ্ঞানশিক্ষা ও চর্চা বাংলায় শুরু হওয়ার মানে এই নয় যে সাধারণপাঠ্য পপুলার বই বা সাময়িকীর গুরুত্ব কমে গেল। বরং হওয়া উচিত তার উল্টোটা। সাবিক কর্মপর্বের মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেবে এটা। এখান থেকে সৃষ্টি হবে সার্থক লেখক গোষ্ঠী। পরিভাষা, রচনাশৈলী ইত্যাদি সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এটাই হবে উপযুক্ত স্থল। তাছাড়া বিজ্ঞানকে মাতৃভাষায় চর্চা করার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে একে আমাদের পরিবেশে সর্বব্যাপ্ত করা ; আমাদের জাতীয় মননের, ভাষাভিত্তিক কালচারের অন্তর্ভুক্ত করা। সাধারণ পাঠ্য পপুলার রচনার ভেতর দিয়েই এটা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলো ঝরে ঝরে পড়ে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জাগিয়ে তুলবে।'

কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি এদিক দিয়ে আমরা যতখানি এগিয়েছিলাম এক জায়গায় এসে যেন একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়েছি। এক সময় বাংলা ভাষার পক্ষে প্রতিকূল রাষ্ট্রীয় পরিবেশেও বাংলা একাডেমী, প্রকাশনা সংস্থাগুলো, ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বিদেশী উদ্যোগে এ জাতীয় বিজ্ঞান-সাহিত্যে আমরা বেশ এগুচ্ছিলাম। কিন্তু তারপর নানা কারণে এদের পুস্তক প্রকাশনে ভাটা পড়েছে। বিশেষ করে বাংলা একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠানের উচিত অন্যান্য কাজের সাথে এ দিকটিকে বাঁচিয়ে রাখা। শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, নানা বিচিত্র বইয়ের মাধ্যমে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করাও কর্তব্য মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার খাতিরেই।

পাঠ্যপুস্তকের প্রসঙ্গে এলে মৌলিক বইয়ের সাথে সাথে অনুবাদের কথাটিও ভাবতে হয়। বরং প্রথম দিকে অনুবাদের কথাটি একটু বেশী করেই

ভাবতে হয়। বিশ্বের বাজারে যোগ্য বিশেষজ্ঞদের সাধনার ফলে উপযুক্ত টেক্‌স্ট বইগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। এর ফসল যদি আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষায় নিতে না পারি তাহলে আমাদেরই ক্ষতি। অনুবাদের ফলে বিশ্বজোড়া সাধনায় বাংলার মাধ্যমে আমাদের একবার প্রবেশাধিকার হয়ে গেলে তার-পর যেসব মৌলিক বই আমরা লিখব তার মান বজায় রাখা সহজ হবে। শুধুমাত্র বাংলাতে লেখাই যদি বইয়ের মৌলিকত্ব দাবীর একমাত্র কারণ হয় তাহলে অনুবাদই ভালো। তাছাড়া সর্বস্তরে উপযুক্ত মানের বিজ্ঞানশিক্ষা বাংলায় দিতে গেলে খুব দ্রুত অসংখ্য পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন হবে নানা বিষয়ে। লাইব্রেরীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে তাড়াতাড়ি বাংলায় রূপান্তরিত করতে হলে অনুবাদের সাহায্য নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মৌলিক রচনার চেয়ে অনুবাদ করা সহজতর, দ্রুততর। পরিভাষা তালিকা তৈরী থাকলে, ভাষারীতি মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেলে অনেক বেশী সংখ্যক কর্মী অনুবাদের কাজে সাহায্য করতে পারবে। বাংলা একাডেমীর এই বিষয়ে নজর দেয়া উচিত। তাছাড়া রুটিনভিত্তিতে অনেক বইয়ের দ্রুত অনুবাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র অনুবাদ ব্যুরোর প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই তীব্রতরভাবে অনুভূত হচ্ছে।

মৌলিক গ্রন্থ রচনার কাজও সাথে সাথে চলতে হবে। বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ের উপর আলোচনা দেশীয় পটভূমিতে হওয়া প্রয়োজন বিশেষ করে জীব বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদির প্রায়োগিক বিষয়ে পাঠ্যবস্তু দেশীয় ভিত্তিতেই পুনর্লিখিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা ও গবেষণার বিশেষ বিশেষ দিকের উপর জোরও দিতে হবে নিজেদের প্রয়োজনে। এসব বই আমাদেরকেই লিখতে হবে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার একটা প্রধান কারণই এটা। এ উদ্দেশ্য নিবেদিত-প্রাণ আচার্য প্রফুল্ল রায়ের কথায় 'বাংলার দোয়েল, বাংলার পাপিয়া, বাংলার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাংলার মশা, বাংলার সাপ, বাংলার মাছ, বাংলার কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এদেশের সোদাল,

বেল, বাবলা ও শ্যেওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে?'

মৌলিক গ্রন্থ লেখার ভার তাঁদেরই উপর থাকবে বিষয়ের উপর যাঁদের পূর্ণ দখল আছে, এর প্রতি যাঁদের বিশেষ বক্তব্য বা দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে, উপস্থাপনের নিজস্ব ভঙ্গী আছে। নইলে শুধু বাংলাতে লেখার জন্য মৌলিক গ্রন্থের অবতারণার প্রয়োজন নেই। মৌলিক গ্রন্থ রচনায় খুব বেশী দ্রুততা আশা করা উচিত হবে না। দ্রুততার দায়টি আপাতত অনুবাদ দিয়েই সারতে হবে।

উল্লিখিত প্রয়োজনের পটভূমিতে বর্তমানে মজুদ পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যার দিকে তাকালে বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষার কথা বলতে রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করা উচিত। সব বিষয় মিলে বর্তমানে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তক আছে একশত। আর ব্যক্তি মালিকানার প্রকাশনীগুলোর পাঠ্যপুস্তক রয়েছে অল্প কিছু। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আছে পদার্থবিদ্যার তিনটি, রসায়নে ছয়টি, উদ্ভিদবিদ্যায় চারটি, ভূগোলে একটি, কৃষি বিজ্ঞানে একটি এবং বাকী এই হারে। এই পুঁজি নিয়ে উপরের দিকে কোন স্তরেই সত্যিকার অর্থে বাংলা মাধ্যম করা বাতুলতা মাত্র। একাডেমী অবশ্য এখন বহু পাঠ্যপুস্তক লেখানোর কাজে হাত দিয়েছে, এদের বেশীর ভাগই মৌলিক গ্রন্থ। একাডেমীর তরফ থেকে অভিযোগ আছে যে ভারপ্রাপ্ত লেখকরা দ্রুততার সাথে তাঁদের কর্তব্য পালন করছেন না। এর কারণও দুর্লক্ষ্য নয়। লিখতে দেয়ার আগে পরিভাষা তালিকা নির্দিষ্টকৃত হয়নি। যাঁরা লিখছেন, তাঁদের সবাই বাংলায় লিখতে অভ্যস্ত নন। তাছাড়া মৌলিক গ্রন্থ লিখতে সময় লাগে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এটা লেখা যায় না। এর জন্য এই পর্যায়ে অনুবাদের উপর জোর দিলেই একাডেমী ভাল করত। এসব প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধা দূর করে অনেক বেশী সংখ্যায় পাঠ্যপুস্তক আসতে না থাকলে সর্বস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা কেবল কথাই থাকবে।

যদিও বিজ্ঞানবিষয়ক বইগুলোর ব্যাপক প্রকাশনার মূল দায়িত্ব থাকবে

সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়নির্ভর সংস্থাগুলোর উপর, তবুও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ মৌলিক বা অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করলে এবং সেগুলো উপযুক্ত মান অর্জন করলে তাদেরকেও প্রকাশনায় সাহায্য করা উচিত। এতে করে পুরো কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র্য ও উৎসাহের সৃষ্টি হবে।

ভাষা সম্বন্ধে সম্প্রতি সৃষ্ট আবেগের উচ্ছ্বাসে একটি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা মাঝে মাঝে হারিয়ে যেতে দেখা গেছে। এটি হলো ইংরেজী ভাষা এবং সাধারণভাবে দ্বিতীয় ভাষার প্রসঙ্গে। যাদের ভাষা ইতিমধ্যেই খুব উন্নত ও বহুকাল ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত, তাদেরও স্কুলের এক পর্যায়ে একটি দ্বিতীয় ভাষা সবাইকে শিখতে হয়। এর কারণ নানাবিধ। আমাদের দেশে এই প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত বেশী। আমাদের অনুবাদকর্ম ও পুস্তকরচনা যতই সাফল্য লাভ করুক, গোড়ার দিক থেকেই অন্তত একটি আন্তর্জাতিক ভাষায় প্রবেশাধিকার না থাকলে বিজ্ঞানের ছাত্রকে মারাত্মক সীমাবদ্ধতায় ভুগতে হবে। চিন্তাভাবনা, লেখাপড়া সবই মাতৃভাষায় হলেও এই প্রবেশাধিকারটুকু থাকতে হবে। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানের যত বইপত্র বাংলায় আনতে পারব তার চেয়ে অনেকগুণে বেশী বই থাকবে ইংরেজীর মত একটি আন্তর্জাতিক ভাষায়। কারণ একাধিক উন্নত জাতি এর চর্চায় রত, বিজ্ঞানের চর্চাকারীদের সংখ্যা এই ভাষা-ভাষীদের মধ্যে বেশী। ব্যাপক রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবলও এদের বেশী। কাজেই এ ভাষায় সুযোগটুকু না নিলে আমাদের চলবে না। আন্তর্জাতিকতার কারণে পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশেরই দ্বিতীয় ভাষা আজ ইংরেজী। এর মধ্যে রাশিয়া, চীন, জাপান ও জার্মানীর মত দেশগুলোও রয়েছে। ইংরেজীর ব্যাপারে আমাদের ঐতিহাসিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা করতে আপত্তি থাকবে কেন ?

অনেকে এই দ্বিতীয় ভাষার সাথে বিভিন্ন ভাষা শেখা, ভাষা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি কথা গুলিয়ে ফেলেন। স্নাতকোত্তর বা গবেষণা স্তরে গিয়ে আরো দু'একটি ভাষা শেখার প্রয়োজন হতে পারে। গোড়া

থেকে বাংলার সাথে ইংরেজীর অভ্যাসটা কিছু থাকলে এই পর্যায়ে আরেকটি ভাষা শেখা খুব সময় বা পরিশ্রমসাপেক্ষ হওয়ার কথা নয়। সীমিত প্রয়োজনে দেশে বিদেশে স্নাতকোত্তর ছাত্ররা এটা হরদম করছে। আমাদের দেশ থেকে যারা রাশিয়া বা জাপান পড়তে যাচ্ছে বছর খানেকের চেষ্টাতে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই ভাষা শিখে তারা এর মাধ্যমে রীতিমত লেখাপড়া করে আসছে। দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজীটা আগে থেকে না জানলে এটা কি তত সহজ হতো ? তাছাড়া বেশীর ভাগ বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত বাড়তি শুধু ইংরেজীটা জানলেই চলে যাবে। বাংলায় সবকিছু পড়লেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দিকে গিয়ে বিজ্ঞানের ছাত্ররা ইংরেজীতে টেকনিক্যাল বই, প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়া, লেখা ও অনুবাদ করার অভ্যাস করবে একটা কোর্সের মাধ্যমে। সীমিত সংখ্যক ছাত্র এই একই কাজ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় করার শিক্ষা নেবে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ কর্মপর্বটি শুরু হয়েছে ধীর লয়ে, প্রায় লক্ষ্যহীনভাবে। ওখানে এখানে আংশিক প্রচলন, কাজে নামার ক্ষেত্রে দোটানা অবস্থা ইত্যাদি এই পর্বের আসল লক্ষ্যকেই ব্যর্থ করে দিচ্ছে। এ রকম আংশিক প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য হয়ত ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগুনো। কিন্তু এরকম দোমনা অবস্থায় যা কিছুই করা হোকনা কেন তাতে পদ্ধতির সুফলগুলো দেখা যায় না। বরং শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়ে অনর্থ ঘটে। তাছাড়া বাংলার মাধ্যমে সামনে এগুবার পথ যদি খোলা না থাকে, বাংলায় লেখাপড়ার মানে যদি হয় নিম্নমানের লেখাপড়া, বাংলায় চর্চার মানে যদি হয় দায় সারা চর্চা তাহলে যাদের দরকার তারাই আকৃষ্ট হবে না এদিকে। তাই প্রয়োজন আগাগোড়া তৈরী হয়ে নিয়ে আটঘাট বেঁধে কাজে নামা। এর জন্য বাংলা প্রচলনে যদি কিছু বিলম্বও ঘটে ক্ষতি নেই। পরিভাষার তালিকা সম্পূর্ণ না করে, মৌলিক ও অনূদিত বইয়ের ভাণ্ডার যথেষ্ট বড় না করে, সর্বস্তরের যথেষ্ট পাঠ্যপুস্তক হাতে না নিয়ে ফস্ করে কাউকে বাংলার মাধ্যমে পড়তে বলা মোটেই উচিত নয়।

প্রস্তুতি মোটামুটি সম্পন্ন হলে গোড়া থেকে একদল ছাত্রকে বাংলার মাধ্যমে পড়িয়ে তাদেরকে এই মাধ্যমেই উচ্চতর স্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। তাদের মধ্য থেকেই বের হবে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষিত প্রথম বিজ্ঞানীরা। তারপর থেকে সব শিশু বিজ্ঞান বাংলায় পড়বে, একে আত্মস্থ করবে। বাংলার মাধ্যমেই এই শিশু একদিন বিজ্ঞানী হবে, অন্তত বিজ্ঞান সচেতন নাগরিক হবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার সর্বত্র একই শৃঙ্খলায়, একই ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা ও চর্চা চলতে থাকবে। পরিবর্তনের সময় শিক্ষকদের সাংঘাতিক কিছু অসুবিধে হবেনা যদি তাঁদের মধ্যে আগে থেকেই একটু সচেতনতা থাকে। তাঁদেরইতো অনেকে প্রয়োজনে ছয়মাসে জাপানী শিখে লেখাপড়া করেন। কাজেই সে মুহূর্ত যখন উপস্থিত হবে, একটু সচেতন চেষ্টা দ্বারা, প্রয়োজনে ছোট একটা কোর্স গ্রহণ করে, নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষার কাজ নিতে তাঁদের খুব কষ্ট হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া ইতিমধ্যে প্রস্তুতির কাজে তাঁদের এত বেশী জড়িয়ে যেতে হবে যে পরিবর্তনটি মোটের উপর স্বাভাবিক মনে হবে।

উল্লিখিত এই কর্ম পদ্ধতির জন্য অসীম সময় লাগালে চলবে না। দীর্ঘসূত্রিতা পুরো পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ করবে। প্রচলন তাৎক্ষণিক না হলেও কর্মকাণ্ডটি এই মুহূর্তেই সমস্ত শক্তি দিয়ে শুরু করতে হবে। তারপর ন্যূনতম যা সময় লাগবে তা দিয়েই হবে।

আজ আমরা বেশীর ভাগ ধার করা বিদ্যা শিখছি বলে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনটি হয়ত তেমন করে অনুভব করছি না। ক্রমে বিজ্ঞান যখন আমাদের কাছে আরো প্রাসঙ্গিক হবে, ক্রমে আরো বেশী অবদান যখন এখান থেকে যাবে তখন ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকতর মনে হবে। মাতৃভাষাই আবার আরো বেশী সংখ্যক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিয়ে, বিজ্ঞানকে আমাদের মননে স্বভাবজ করে এই লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

কিন্তু তাই বলে এই মুহূর্তে **Jornal of Physical Society** কে

বাংলায় হতে বলা বা উচ্চতর বিজ্ঞানের কনফারেন্সে বাংলায় 'পেপার' দিতে বলা কার্যসিদ্ধির জন্য উত্তম প্রস্তাব নয়। আপাতত আমরা ইংরেজী পেপারের উপর বাংলায় একটা সংক্ষিপ্তসার দেয়ার চেষ্টাই করিনা কেন। সেটা হবে প্রস্তুতি হিসাবে চমৎকার, অথচ বিঘ্ন ঘটাবেনা কাজেও। জাপানীরা শুরুতে তাই করত। তারপর ধীরে ধীরে পটভূমির বিস্তার হলে মূল পেপারটি বাংলা করে সংক্ষিপ্তসারটি ইংরেজীতে হবে। জাপানীরা আজ তাই করে। ইংরেজী সংক্ষিপ্তসারটি কোন সময় বাদ দেওয়া হবেনা, আমাদের স্বার্থেই। ওতে আমাদের দৈন্য প্রকাশ পাবে না, আগ্রহই প্রকাশ পাবে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক কর্মপর্বের সূচনার প্রত্যাশী আমরা। এ সম্পর্কে উচ্ছ্বাসমূলক আলোচনার বদলে সমস্যাসমূহের সমাধান চেষ্টাই এই কর্মপর্বে গুরুত্ব পাওয়া উচিত। তা হলেই ভবিষ্যৎ আমাদের স্বাগত জানাবে।

১৯৭৪

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষায় বাংলা মাধ্যম

প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল দীর্ঘদিন আগে, ইংরেজ আমলের শেষের দিকে স্কুলের পাঠে বাংলা মাধ্যমের প্রচলনের মধ্য দিয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে প্রথম বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনারও সূত্রপাত করেছিল তৎকালীন ভার্ণাকুলার টেক্সট বুক কমিটি। সেদিন থেকে আমরা অনেকখানি এগিয়ে এসেছি; কিন্তু ফলপ্রসূ হবার মত যথেষ্ট এগিয়েছি কি?

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে আত্মস্থ করব, বাংলা ভাষার এই ব্যবহারের পেছনে এমনি আশাই কাজ করেছে। কিন্তু জ্ঞানের যেখানে সৃষ্টি, যেখানে এর সর্বাধিক চর্চা সেখানে গিয়েই যদি বাংলার ভূমিকা ফুরিয়ে যায়, তা হলে ঐ আত্মস্থ করার আশা পূরণ হয় কি? বরং দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার মাধ্যমের দ্বৈততার ফলে শিক্ষার নিরবিচ্ছিন্নতা ব্যাহত হচ্ছে. উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণার ফসলগুলো ব্যাপকতর পর্যায়ে সিঞ্চিত করার সুযোগ কম থাকছে। শিক্ষার আগাগোড়া মাধ্যম বাংলা হলে শিক্ষার্থী যে স্থৈর্য ও নিশ্চয়তা নিয়ে এই মাধ্যমটি আয়ত্ত করার চেষ্টা করতো এখন তা হচ্ছে না। এটি প্রতিফলিত হচ্ছে বাংলার সন্তোষজনক মানের অভাব এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এর উন্নয়নে নিষ্ঠার অভাবের মধ্যে।

অথচ এ পর্যায়ে এমনটি হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। গত কয়েক দশকে যে অগ্রগতি হয়েছে তার ভিত্তিতে আরো এগিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু কেন জানি না বিষয়টিকে আমরা ক্রমাগত আলোচনার বিষয় করে রেখেছি, উদ্যোগের বিষয় না করে। এখানে চুল-চেরা বিচারে আদর্শ অবস্থা সৃষ্টির চেয়েও বড় কাজ ছিল যখন যতটুকু

করা যাচ্ছে তার ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়া। সে ভাবে শুরু করে দিলে এদ্দিনে অনেকখানি অগ্রগতি হয়েও যেত। নীতিগতভাবে আমরা শিক্ষার্থীকে বাংলা মাধ্যম ব্যবহারের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু এমন বহু বিষয় রয়েছে যেখানে এ মাধ্যম ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীদের জন্য যে একটি মাত্র প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ থাকে তা হলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের একটি বাংলা অনুবাদ সাথে দিয়ে দেয়া। আসলে শিক্ষার্থীর চতুর্দিকে সাধারণত এমন পরিবেশ থাকে না যাতে সে বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া করেও সতীর্থদের মধ্যে অগ্রগামী একজন হতে পারে। আমরা অবশ্য সেজন্য উদ্বিগ্নও নই। কারণ প্রচুর আলোচনা করে আমরা বার বার বলেছি যে যদ্দিন অনেক পাঠ্যপুস্তক বাংলায় না পাওয়া যাচ্ছে, অনুবাদ সংস্থা স্থাপিত না হচ্ছে. পরিভাষার সব কথার সমাধান না হচ্ছে তদ্দিন এর বেশী সম্ভব নয়। এর মধ্যে ছুষ্ট-বৃত্তটি যেন আমরা দেখেও দেখছি না। বাংলা ব্যবহারের সর্বাত্মক প্রয়োজনীয়তা দেখা না দিলে একত্রে এত সব চাহিদা মেটার কোন সম্ভাবনা নেই।

ক্ষেত্র কিন্তু প্রস্তুতই রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ব শিক্ষা এখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে বাংলা মাধ্যমের অন্তর্গত। উচ্চ শিক্ষার প্রত্যাশী ছাত্রছাত্রীদের কাছে বাংলাটাই এখন স্বাভাবিক, পরিচিত মাধ্যম। পরবর্তী পদক্ষেপটিও বাংলার মাধ্যমে নেয়া হলে অন্তত তাদের দিক থেকে কিছুই অস্বাভাবিক হবে না। এক আড়ষ্টতা যদি আদৌ বোধ হয় তবে তা হবে শিক্ষাদানকারীর, শিক্ষা ব্যবস্থার, শিক্ষার্থীর নয়। বাংলা মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা নেওয়াকে আমরা যদি মনে করি এক ধরনের অক্ষমতা হিসাবে, মন্দের ভাল হিসাবে তাহলে এটা কবে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? মাধ্যম হিসাবে একে মুখে ও কাজে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দিয়েই এগোতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যম ব্যবহার না করাটাই যেন ব্যতিক্রম হয় নিয়ম নয়।

উল্লিখিত পদক্ষেপটি তখনই নেয়া সম্ভব যদি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখা হয়। প্রথমত এ

পর্যায় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির পর্যায় বলে এখনকার প্রত্যেকটি বিষয়ের কিছু নিজস্ব নিয়ম- কানুন, বাগধারা, প্রতীকী-স্বকীয়তা থাকবে ভাষাভেদেও যার নিরসন সম্ভব নয়। মাধ্যম যে ভাষাই হোক না কেন একমাত্র নিরবিচ্ছিন্ন চর্চার মাধ্যমেই এতে বিহারের ক্ষমতা অর্জন সম্ভব। মাধ্যম বাংলা করার সময়ও তা বিষয়ের যাবতীয় জটিলতাকে ও স্বকীয়তাকে ধারণ করবে; সেজন্য তাকে অস্বাভাবিক বাংলা মনে করার কারণ যেন না ঘটে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্টটি হল এ পর্যায়ে শিক্ষাকে কয়েকটি মাত্র পাঠ্য পুস্তকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। বিভিন্ন গ্রন্থ ও জার্নালের মাধ্যমে বিশ্ব-জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আহরণের সুযোগ এখানে অবারিত রাখতে হয়। তাই বাংলাকে মাধ্যম করার পরও ইংরেজীতে নিজ বিষয়ে লেখা-পড়া করার ক্ষমতা এই স্তরের শিক্ষার্থীর যথেষ্ট থাকা চাই। স্কুল পর্যায় থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর যে চর্চা তার একটি প্রধান লক্ষ্য হবে এই ক্ষমতা অর্জন। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে যারা উচ্চতর শিক্ষা লাভে আগ্রহী হবে অন্তত তাদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিষয়ে ইংরেজী বই পড়ে বুঝবার ভাষাগত দক্ষতা আশা করা হবে। এজন্য উচ্চ মাধ্যমিক, এমন কি প্রয়োজনে তার পরেও কলা, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ইত্যাদি বিভিন্ন ঐচ্ছিক শাখায় বিভক্ত বিশেষ ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে পারে। এতে এসব শাখায় ব্যবহৃত ইংরেজী পরিভাষা, রচনারীতি ও বাগধারার সাথে পরিচিত হবার কিছু সাধারণ সুযোগ শিক্ষার্থীর ঘটবে।

এ সব সত্ত্বেও মূল মাধ্যমটি কিন্তু বাংলাই হবে এবং তা স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। মাধ্যম বাংলা হওয়ার অর্থ হল শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বাংলাতে বক্তৃতা শুনবে বাংলায় আলোচনা করবে, যা কিছু পাঠ্য-বস্তু এ সম্বন্ধে বাংলায় রয়েছে তা তো পড়বেই, সাথে ইংরেজী রেফারেন্স পুস্তক পড়বে, এবং বাংলায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দেবে। ইংরেজী বই পড়লেও

তা সে আত্মস্থ করবে বাংলার মাধ্যমেই। এ রকম ব্যবস্থায় সমস্ত পাঠ্য পুস্তক বাংলাতে থাকতে হবে এমন পূর্ব শর্ত আরোপ না করেও এগোনো যায়।

উচ্চতর পর্যায়ে বহুবিধ বিষয় এবং তাদের বহু শাখা-প্রশাখা নিয়ে কারবার। পাঠ্যসূচীও এখানে দ্রুত পরিবর্তনশীল। অথচ সে তুলনায় এক একটি বইয়ের পাঠক সংখ্যা সীমিত। কাজেই সব বিষয়ের সব বই বাংলায় মুদ্রিত থাকতে হবে এমন আশা শুধু আজকের জন্যই নয় অনাগত বহুদিনের জন্যই অবাস্তব। যা এখনই করতে হবে তা হল এক একটি বিষয়ে বহুলপাঠ্য কয়েকটি মূল বই বাংলায় মুদ্রণের ব্যবস্থা করা। এগুলো মৌলিক বা অনুবাদ উভয়েই হতে পারে। বিভিন্ন কোর্স দেবার উপযোগী পাঠ্যবস্তু বাংলায় লিখে ফেলার জন্য কোর্স দানকারী শিক্ষককেই উৎসাহিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিভাগ ও ইনস্টিটিউটসমূহের মাধ্যমে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। এ সব কোর্স-বস্তু সাইক্লোস্টাইল বা জিরোক্স করে সীমিত মুদ্রণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজলভ্য করা হবে। এ অবস্থায় কোর্স-বস্তুর উন্নয়ন এবং তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথও খোলা থাকবে। বর্তমান লেখকের উত্থাপিত এ মর্মে একটি প্রস্তাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটে গৃহীত হয়েছে।

উল্লিখিত কোর্স-বস্তু-গুলোর কোন কোনটি ধীরে ধীরে পাঠ্য পুস্তকের আকার গ্রহণ করবে এবং তা মুদ্রণের জন্যও বিবেচিত হবে। এভাবে বাংলা ভাষাতেও পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স পুস্তকের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মাধ্যম হিসাবে বাংলার ব্যবহার তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে না। বরং বাংলায় পঠন-পাঠনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত হবে বলে বইগুলোর উপযুক্ততা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাবে। আসলে মাধ্যম হিসাবে বাংলা চালু করার জন্য সব চেয়ে যা বেশী প্রয়োজন তা হল বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে বাংলায় আলোচনা ও লেখাপড়ার একটি আবহ সৃষ্টি করা। এ রকম অবস্থায়

উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত যে কোন বিষয়ের আলোচনা বাংলায় স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ মনে হবে—ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক উপযোজনকারী সবার জন্যই। তখন সবাই বিষয়গুলো নিয়ে বাংলায় লিখতেও অধিকতর উৎসাহী হবেন।

নিজভাষায় সীমিত সংখ্যক এবং আন্তর্জাতিক ভাষায় অনেক বেশী সংখ্যক পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে এমন নজীর বহু রয়েছে। এমনকি দেশ হিসাবে অত্যন্ত উন্নত, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক অবদানশীল হয়েও কেউ কেউ এই নীতি অনুসরণ করছে। উদাহরণ স্বরূপ সুইডেনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুইডেনের বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থার সাথে বর্তমান লেখকের বেশ কিছুদিনের পরিচিতি-কালে দেখা গেছে সেখানে একজন স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ছাত্র তার অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকের জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে ব্যবহৃত ইংরেজী বইয়ের উপর নির্ভর করে। ধনী দেশ হওয়া সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংখ্যক লোকের ভাষা হওয়ার কারণে সুইডিশ ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা সীমিত। বহুল ব্যবহৃত কিছু বই, লেকচার নোট, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মনোগ্রাফ ইত্যাদিই সুইডিশে বেশী পাওয়া যায়। অথচ সেখানে শিক্ষার মাধ্যম সুইডিশ ছাড়া অন্য কিছু এমন কথা কেউ বলবে না। ক্লাস রুমে, সেমিনারে, ল্যাবেরেটরীতে, ডক্টরেট থিসিসে সুইডিশ ভাষার একছত্র আধিপত্য—এমনকি বিদেশীদের জন্যও তার ব্যতিক্রম কদাচিৎ হয়। এমন ও নয় যে সুইডেনবাসীরা ইংরেজীকে অত্যন্ত আপন মনে করে বা সবাই তা লিখতে-পড়তে-বলতে অভ্যস্ত। সাধারণ শিক্ষিত সুইডেনবাসী ইংরেজী আমাদের তুলনায় বড় একটা বেশী জানে না স্কুলে তা পড়া সত্ত্বেও। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেই পুস্তক, গবেষণা ইত্যাদির কারণে ইংরেজীর চল রয়েছে, কোনক্রমেই তা সুইডিশভাষাকে ছাড়িয়ে গিয়ে নয়। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী ইংরেজী বইতেই ঠাসা—অথচ সর্বত্র সুইডিশভাষার পরিবেশ। এমন অবস্থা আমাদের দেশেও অস্বাভাবিক মনে হবার কোন কারণ নেই।

শুধু সুইডেন কেন, আমাদের কাছাকাছিও বহু নজীর রয়েছে এ রকম ব্যবস্থার। জর্দান, সিরিয়া, আলজেরিয়া সহ বেশ কিছু আরবদেশে এটা আছে। মাধ্যম আরবী, পাঠ্যপুস্তক প্রধানত ইংরেজী অথবা ফরাসী, শুধু কিছু কিছু পুস্তক আরবীতে অনূদিত। আমাদের দেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াবার জন্য যে সব শিক্ষক ওখানে যান, তাঁদেরও অনেক সময় ল্যাবোরেটরীতে এবং উত্তরপত্র পরীক্ষা করার জন্য দোভাষীর সহায়তা নিতে হয়। এতে বোঝা যাচ্ছে—যে আরবী ভাষী শিক্ষকের অভাব সত্ত্বেও ওরা আরবী মাধ্যমের থেকে পিছ পা হচ্ছে না। কিন্তু সাথে সাথে ইংরেজী ফরাসীর যেটুকু ব্যবহার অনিবার্যভাবে এসে পড়ছে পাঠ্য পুস্তকের ক্ষেত্রে, বিদেশী শিক্ষকের বক্তৃতার ক্ষেত্রে সেটা তারা মেনেও নিচ্ছে। বলা বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সব দেশে ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় পারদর্শিতা আমাদের সাধারণ ছাত্রদের ইংরেজী পারদর্শিতার চেয়ে অধিক নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে পাঠ্য-বস্তু নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার একটি অন্য দিকও রয়েছে। দেশী বা বিদেশী গতানুগতিক পাঠ্য-পুস্তকগুলো আজকের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বাস্তব অবস্থার চাহিদা মেটাতে সব সময় সমর্থ হচ্ছে না। নির্দিষ্ট কিছু পাঠ্যপুস্তকের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল না হয়ে কোর্সের মধ্যে প্রয়োজনীয় উপাদান ও নমনীয়তার সন্নিবেশ ঘটানো প্রয়োজন হয় যাতে করে কোর্সটি তার লক্ষ্যের সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। আমাদের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স পদ্ধতি চালু করার পর এরকম নমনীয়-তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে। ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বেশ কিছুদিন ধরে ইউনিভার্সিটি লীডারশীপ প্রজেক্ট নামে একটি প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে এভাবে পাঠ্য-বস্তুর উন্নয়নে উৎসাহিত করে আসছে। এভাবে যে সব পাঠ্যবস্তু সৃষ্টি হয়েছে তার বেশ কিছু সাইক্লোস্টাইল করা পৃষ্ঠাকে বাঁধাই করে পরিবেশন করা হচ্ছে। ওখানে ভাষাস্তরটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়,

পাঠ্যবস্তুর উন্নয়নটাই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই একই উদ্যোগ নিয়ে আমরা উভয়বিধ উদ্দেশ্য চমৎকার ভাবে পূরণ করতে সক্ষম হব।

পাঠ্য-বস্তুর সৃষ্টিতে পরিভাষা সমস্যাটি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। এর সহজতম এবং সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত সমাধান হল এ সম্বন্ধে গোঁড়ামীকে দূরে রাখা। বিষয় ভেদে পরিভাষার মধ্যে ইংরেজীতে ব্যবহৃত অসংখ্য শব্দ চলে আসবে, বাংলা অক্ষরের সাজে। তা নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই। অবশ্য আরো বহু শব্দ থাকবে যার সুন্দর, স্বীকৃত বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা যাবে। এ ব্যাপারে মোটা-মুটি এ রকম একটা নীতি করে নেওয়া যায়: স্কুল-কলেজে দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে যে সব বাংলা পরিভাষা ইতিমধ্যেই বেশ পরিচিত হয়ে গেছে সেগুলো হুবহু ওভাবেই ব্যবহার করা যাবে উচ্চতর স্তরেও। এ স্তরে নূতন যে সব পারিভাষিক শব্দের সাক্ষাৎ ঘটবে তাদের বাংলা প্রতিশব্দ করা হবে শুধু একটি শর্তে—যদি তাতে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে অধিকতর সহায়ক হয়। যদি তা না হয় তাহলে যে গ্রীক, ল্যাটিন, বা অন্যতর শব্দ ইংরেজীতে ব্যবহৃত হচ্ছে তা বাংলাতেও রেখে দিলে ক্ষতির কিছু নেই। উভয়ক্ষেত্রে এর অর্থ আরোপিত সংজ্ঞা থেকেই স্পষ্ট হবে, শব্দের নিজস্ব কারণে নয়। যে ক্ষেত্রে বাংলা প্রতিশব্দ করা হবে তা নির্ধারণের জন্য যে ভাবে অতীতের পরিভাষা কমিটির সহায়তা নেয়া হয়েছে, আবার তা নেয়া যায়।

বেশ কিছু পরিভাষা ইংরেজীর অনুরূপ রেখে দিতে পারলে তাতে একটি বড় লাভ হবে ইংরেজী রেফারেন্স বই পড়ার সময় দুই সেট পরিভাষার ধাক্কা সামলাতে হবে কম। অবশ্য এই দুই সেট পরি-ভাষার ব্যাপারটা পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কলেজ স্তরের লেখাপড়ার সময় থেকে শুরু করে পারিভাষিক শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়ার সময় অন্তত এক জায়গায় তার ইংরেজী রূপটির সাথেও পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। সহজে উল্টেয় দেখা যায় এ রকম ইংরেজী

বাংলা পরিভাষা-কোষও সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন। আর সব চেয়ে বড় কথা হল এই পর্যায়ে বাংলা মাধ্যমে লেখার সময় শিক্ষার্থীর ইংরেজী পরিভাষা ব্যবহারকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। দুই সেট পরিভাষার সব কিছু ঠিকমত মনে না রাখতে পারার খেসারত যেন তাদের দিতে না হয়। হাজার হলেও আমরা নিজ ভাষায় একটি বিষয়ের চর্চা করতে পারাটাকেই বড় করে দেখছি, চর্চা করতে গিয়ে নিজ ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষাকে নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে গবেষণার প্রশ্নটি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে, গবেষণার ক্ষেত্রেও সেই একই নীতি প্রযোজ্য হতে পারে। এখানে ইংরেজী বাংলা ও অন্যান্য সমস্ত উৎস ব্যবহার করেও বাংলায় গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যতীত সমস্ত কাজকর্ম, আলোচনা, লেখা-জোকা বাংলায় চলতে পারে। তবে উৎসের ব্যবহারে এবং প্রয়োজন-বোধে গবেষণা সম্পর্কে ইংরেজীতে লেখার বা আলোচনায় যাতে অসুবিধা না হয় সে জন্য গবেষণা-ছাত্রদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে। এই ব্যবস্থাটুকু অজকাল আনেককেই নিতে হচ্ছে। জ্ঞানবিজ্ঞানে বহুল অবদানশীল ভাষা নিজেদের হওয়া সত্ত্বেও বহু উন্নত দেশের গবেষকদেরকেও ইংরেজী বা ফরাসী ভাষার চর্চা খানিকটা করতে হচ্ছে। এমনকি জার্মান বা সোভিয়েত গবেষকরাও এর ব্যতিক্রম নন।

আগেই যে কথাটি বলা হয়েছে, বাংলা ব্যবহারের আবহ সৃষ্টিটাই বড় কথা। এই আবহ সৃষ্টিটা শুধু শিক্ষক ছাত্রের ব্যাপারও নয়। পণ্ডিত-সমাজ, বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী, পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন তাঁদের আলোচনায় বসেন তাঁরা কোন্ ভাষা ব্যবহার করেন তাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পরিচালকরা কোন্ ভাষা পছন্দ করছেন তাও গুরুত্বপূর্ণ। তাবে সব কিছু মিলিয়েই এ আবহ সৃষ্টি হবে। এ মুহূর্তে খুব বড় কিছু বা অনেক কিছু ঘটার জন্য অপেক্ষা না করে কিছু প্রাথমিক উদ্যোগের

মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমকে শিক্ষার সর্বস্তরে চালু করে দেয়া উচিত। এতে হঠাৎ করে সমস্ত অগ্রগতি অচল হয়ে পড়বে, তা মনে হয়না। হোকনা তাতে কিছু দিন এক ধরনের দোআঁশলা পরিস্থিতির সৃষ্টি, তবুও তো সেটা বাংলাতেই হবে।

১৯৮৪

ব্রিটিশ এসোসিয়েশন সম্মেলন ঃ
শতাব্দীখ্যাত বিজ্ঞান উৎসব

পুরো নাম হলো ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ফর এডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স। কিন্তু ব্রিটেনের ছেলে বুড়ো সর্বসাধারণের কাছে এর নাম ব্রিটিশ এসোসিয়েশন— পুরো নামটা অল্পই ব্যবহৃত হয়। এর থেকে বোঝা যায় এর সার্বজনীনতা ও জনপ্রিয়তা। বয়সও এর যথেষ্ট—প্রায় দেড়শ বছর। ডিকেন্সের 'পিকউইক পেপারস'-এ একে নিয়ে ঠাট্টা সমালোচনা কম হয়নি। তা সত্ত্বেও আজও এটা টিকে আছে, দিন দিন এর গুরুত্বও বাড়ছে। হয়ত এর কারণ আজকের এই বিশেষজ্ঞদের দুর্বোধ্য প্রাচীরের যুগে এই একটি সংস্থা বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানী ও অবিজ্ঞানী জনসাধারণকে এক জায়গায় একত্র করতে পারে। জ্ঞানকে যাঁরা সৃষ্টি করছেন, যাঁরা ব্যবহার করছেন, যাঁদের জীবন তার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে—তাঁরা সবাই এই একটি জায়গায় এসে ভাব বিনিময় করতে পারেন। এই দেড় শতাব্দীতে সমাজ ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক বদলেছে, কিন্তু এই কাজের গুরুত্ব কমেনি একটুও। বরং বিজ্ঞানের পরিসর, মঙ্গল-অমঙ্গল উভয়েরই ফল-শ্রুতি ঘটাতে এর ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে হাজার গুণে। ব্রিটিশ এসো-সিয়েশনের মত সংস্থার গুরুত্বও তাই বেড়েছে বই কমেনি।

ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের প্রধানতম কাজ হলো প্রতি বছর একটি সম্মেলন আয়োজন করা। বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী নির্বিশেষে কয়েক হাজার বিজ্ঞা-নোৎসাহী এই উপলক্ষে একত্র হন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁদের সামনে বলেন দেশের খ্যাতনামা

বিজ্ঞানীরা। একে তাঁরা তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব মনে করেন। বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলোর নীতি নির্ধারণে যাঁরা আছেন তাঁদেরও অনেকে আসেন শুনতে ও শোনাতে। বিভিন্ন বিষয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও তার সমাজসম্পর্ক সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার জন্য আগে থেকেই কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। সম্মেলনে এসব কমিটি সবার জন্য তাঁদের বিবেচনার ফলাফল নিয়ে আসেন। ব্রিটিশ এসোসিয়েশন সব সময়েই দেশের সেরা একজন বিজ্ঞানীকে এক এক বছরের জন্য তার সভাপতি রূপে পেয়ে এসেছে। সম্মেলনে তার মূল ভাষণটি সাধারণত একটি স্মরণীয় বক্তৃতা হয়ে থাকে-যার মাধ্যমে বিজ্ঞানের একটি দিকের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অবহিত হতে পারে।

গত ২৭শে আগস্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী এই সম্মেলন হয়ে গেল গিলফোর্ডের সারে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। সবকিছু মিলিয়ে এ যেন এক বিজ্ঞান মহোৎসব। ছাত্ররা এসেছে বড় বড় বিজ্ঞানীদের মুখে এর নানান দিকের কথা শুনবে বলে। এসেছে থুড়-থুড়ে বুড়ী—বিজ্ঞানের প্রতি যার আকর্ষণ এখনো অব্যাহত। পঞ্চাশ বছর আগে স্যার জেমস্ জীনসের ব্রিটিশ এসোসিয়েশন সভাপতির ভাষণে বিশ্বসৃষ্টির তদানীন্তন জ্ঞানের কথা শুনেছিলেন আজ আবার শুনবেন একই বিষয়ে স্যার বার্ণার্ড লোভেলের ভাষণ। স্বামী-স্ত্রী তাঁদের স্কুলগামী পুত্র-কন্যাদের নিয়ে এসেছেন। উদ্দেশ্য এবারকার ছুটিটা একটু অন্যভাবে কাটাবেন—ছেলে-মেয়েদেরকে বিজ্ঞানে উৎসাহিত করার জন্য। পেশাদার বিজ্ঞানীরাও আছেন। আর দশটি শাখার বিজ্ঞানীরা কি বলছেন, কি ভাবছেন শুনতে তাঁদের আগ্রহ। অনেক উৎসাহ নিয়ে এসেছেন স্কুল মাস্টার। বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতিগত দিকটা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ আছে, তাছাড়া নিজের দিগন্তটাও বাড়িয়ে নিতে চান।

সবার জন্য অনেক কিছু আছে সম্মেলনে। একই সাথে চলছে পাঁচ ছ'টা বক্তৃতা, আলোচনা বিভিন্ন কক্ষে। বিষয়বস্তুও নানাবিধ। সবাই নিজ নিজ পছন্দের আসরে গিয়ে বসছে এ বেলা; ওবেলা

হয়ত অন্য আসরে। যেমন পদার্থবিদ্যার সাথে জড়িত বিষয়গুলোই ধরা যাক। একদিন দেখা হলো কম্প্যুটারের সাথে তার সম্পর্ক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আর একদিন পুরো কাটল শিক্ষায় এবং প্রযুক্তিতে পদার্থবিদ্যার ভূমিকা আলোচনা করে। পদার্থবিদ্যার সাথে জড়িত নয় এমন অনেক লোক আগ্রহ করে শুনলেন 'প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রত্নতত্ত্বের পদার্থবিদ্যার' উপর দেয়া বক্তৃতা মালাগুলো। তেমনি আবার একদিন আলোচিত হলো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সর্বাধুনিক উন্নয়ন ও উপযোজন সম্পর্কে।

রসায়নের আসরে তাঁরা তো একদিন একটা সাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলে বসলেনঃ 'গবেষণা করা কেন'? সারাদিন ধরে চললো আলোচনা। এক পর্যায়ে শোনা হলো বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতামত। আর এক পর্যায়ে সমাজের মতামত—শ্রোতাদের থেকে বিভিন্ন বক্তা উঠে আসলেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি জানানোর জন্য। এই রসায়নামোদীরাই একদিন কাটালেন 'জীবনের রসায়নের' এবং আর একদিন সরবরাহ, ভোগ এবং পুনর্ব্যবহারের রসায়ন' এই পর্যায়ে আলোচনা করে। মাঝখানে স্কুলে বিজ্ঞান ক্লাসকে কিভাবে আরো চমকপ্রদ ও উপযোগী করে তোলা যায় সে সম্পর্কে কতগুলো নূতন টেকনিকের কথা বললেন এ বিষয়ে কয়েকজন গবেষক। এভাবে ভূতত্ত্ব, ভূগোল, পরিবেশবিদ্যা, জীববিদ্যা, অর্থনীতি প্রকৌশল, নৃতত্ত্ব, মনোবিদ্যা—সবারই নিজেদের আসর ছিল। বিজ্ঞান যে সমস্ত প্রশ্ন তুলছে, আজকের জীবন ও সমাজকে বিজ্ঞান যতভাবে নাড়া দিচ্ছে তাদের অনেক কিছুই এসব আসরে আলোচিত হয়েছে।

সাংবাদিকদের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল পুরো সম্মেলনে। বিজ্ঞান সাংবাদিকরা ছিলেন খুবই তৎপর। উত্থাপিত বিভিন্ন আলোচনাকে আরো স্থায়ী রূপ দেয়াটাই তাঁদের লক্ষ্য। তাছাড়া ছিলেন সাধারণ সাংবাদিকরা—দেশের বড় বড় দৈনিক ও সাপ্তাহিকের তরফ থেকে। আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সাথে সাথে সবিস্তারে চলে যাচ্ছিল সংবাদপত্র পাঠকের হাতে। সম্মেলনের সাথে সাথে সারাদেশ জড়িয়ে পড়ছিল আলোচনায়, বিতর্কে।

বৃটিশ এসোসিয়েশনের সাথে জড়িত রয়েছে ছোটদের দুটো প্রতিষ্ঠান —BAYS এবং BASS 'বৃটিশ এসোসিয়েশন ফর ইয়াং সায়েন্টিস্টস' এবং বৃটিশ 'এসোসিয়েশন ফর স্কুল সায়েন্স'। এদের সদস্যরাও আগাগোড়া সম্মেলনে খুবই তৎপর। তারাও এর মধ্যে নিজেদের আলাদা আসর বসিয়েছে, বড়দের আসরেও অংশ নিয়েছে। তাঁদের পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা নিয়েছে।

উৎসবের ভাবটাও ছিল ষোল আনা। বিভিন্ন সম্মেলন কক্ষের বাইরে বসে গিয়েছিল ছোটখাট প্রদর্শনী। নানা চমকপ্রদ যন্ত্রপাতির সমাহার। মনোবিদ্যার গবেষণায় ব্যবহৃত একটি আধুনিক 'মিথ্যা নিরূপণ যন্ত্র' বসানো ছিল এক দিকে। যে যন্ত্রে হাত রেখে সত্য মিথ্যা নানা কথা বলে নিজের স্নায়বিক স্থৈর্য পরীক্ষা করে দেখছিলেন অনেক। কয়েকটা প্রশ্ন করা হচ্ছিল প্রত্যেকের কাছে—অফিসের কোন জিনিস ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেছেন কিনা, সম্প্রতি কোন ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করেছেন কিনা ইত্যাদি। বেশীর ভাগ মিথ্যা ভাষণ যন্ত্রে ধরা পড়ছিল। প্রতিদিন বিকেলে দলে দলে বিভক্ত হয়ে অনেকে বেরিয়ে পড়তেন 'বৈজ্ঞানিক ভ্রমণে'। কাছাকাছি নানান গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে সরজমিনে সবকিছু দেখাটাই এর উদ্দেশ্য। যে যার পছন্দমত গন্তব্য বেছে নিচ্ছেন। দেখছেন আধুনিক বিজ্ঞান সত্যি সত্যি কি আকারের, কিভাবে কাজ করছে।

রাত নামার সাথে সাথে শুরু হতো নানা সামাজিক অনুষ্ঠান—নাটক, ফিল্ম শো, বিভিন্ন গ্রুপের প্রীতিভোজ, কনসার্ট ইত্যাদি। আসরের আলোচনায়, বৈজ্ঞানিক ভ্রমণে বা সামাজিক অনুষ্ঠানের সান্নিধ্যে আসা যায় বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্বের অথবা হয়ত তেমন বিশিষ্ট নন, অথচ এমন একটা অভিজ্ঞতার বা মতামতের অধিকারী যে জন্য আপনি তাঁর সঙ্গ কামনা করবেন। এই সবকিছুই বৃটিশ এসোসিয়েশনের মূল উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত: সবাইকে বিজ্ঞানের দ্রুত লয়ে চলা অগ্রগতির সাথে পরিচিত করা, এর সাথে জড়িত করা, সমাজের সাথে বিজ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় যোগসূত্রটাকে অবিচ্ছিন্ন রাখা।

নোবেল উৎসব ১৯৭৭

পরিবেশে, জাঁকজমকে, সঙ্গীতে এ এক উৎসবই বটে। তবে আর দশটা উৎসবের সাথে এর তফাত হলো, এর যাঁরা নায়ক তাঁদের বিশ্বজোড়া স্বাভাবিক পরিচয় উৎসবের কোলাহলে নয়, জ্ঞানের সীমান্তদেশে নিভৃত সাধনায়। তবুও প্রতিবছর ডিসেম্বরের দশ তারিখ—আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু বার্ষিকীর দিনে—এই উৎসব হয় বিজ্ঞান ও সাহিত্যে বিশ্বের কয়েকজন সেরা কৃতিকে পুরস্কৃত করার জন্য। এর স্থান সুইডেনের স্টকহোলম। সুইডেনবাসীর জন্য, বিশেষ করে এখানকার বিদ্বৎসমাজের জন্য এটি অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তির উৎসব, কারণ এর পৌরহিত্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁদের।

স্টকহোলমের 'কনসার্ট হুসেট'। শহরের একেবারে মাঝখানে, বলতে গেলে বাজারের মধ্যে। বাইরে থেকে দেখতে কিছুটা সাদামাটা, কিন্তু ভেতরটা ইউরোপের সেরা কনসার্ট হলগুলোর ট্র্যাডিশনে তৈরি, 'বেরোক' কায়দার সাজসজ্জায় রীতিমত রাজকীয়। নোবেল উৎসব উপলক্ষে অজস্র তাজা ফুলের সমারোহে এই সজ্জা আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন সুইডেনের সেরা জ্ঞানী-গুণীরা, বিদেশী গুণীজন, সুইডিশ সরকারের সদস্যবর্গ, কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা। মঞ্চে বিশেষ জায়গায় আসন নিয়েছেন সুইডিশ রয়্যাল একাডেমী, সাহিত্য একাডেমী ও নোবেল কমিটির সদস্যবর্গ। আমন্ত্রিত সুধীজনের পোশাক-পরিচ্ছদ লক্ষ্যণীয়। পুরুষদের লম্বা টেইলকোট, সম্মানসূচক মেডাল ইত্যাদি, আর মহিলাদের ফুলেল গাউন ও অলঙ্কারে মনে হচ্ছিল অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের কোন এক রাজন্য সম্বর্ধনা ভুল করে এই যুগে চলে এসেছে। নোবেল উৎসবের একখানা প্রবেশপত্র

যোগাড় করতে পারা এখানকার যে কোন লোকের জন্য সৌভাগ্যের কথা। তবে সুইডেনে কর্মরত বিদেশী বিজ্ঞানী বা গবেষণারত ছাত্রের জন্য এটা অনেক সহজতর।

স্থানটি যেমন কনসার্ট হল, উৎসবের আবহে তেমনি সঙ্গীতের প্রাধান্য। ঘোষক নেই, পরিচালক নেই, আগাগোড়া অনুষ্ঠানের শুরু, ঘটনা পরম্পরা এবং শেষ নিয়ন্ত্রিত হলো সঙ্গীতের মাধ্যমে। যেন অর্কেস্ট্রার কন্‌ডাকটরই আসল লোক, ছড়ি ঘুরিয়ে ছন্দিত ভঙ্গীতে উৎসবকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। সুইডেনের একটি সেরা বাদকদল সবার সমক্ষে সঙ্গীত সৃষ্টি করছিলো আর অদ্ভুত চমৎকার শব্দগুণ সম্পন্ন কনসার্ট হলের প্রতিটি কোণায় তার মূর্চ্ছনা জাগছিল। আবহ সঙ্গীত হঠাৎ পরিবর্তিত হলো সুইডেনের রাজা কার্ল চতুর্দশ গুস্‌তাফের ও রাণী সিলভিয়ার আগমনের কারণে। তাঁরা মঞ্চে আসন নিলে মুহূর্তকাল নীরবতার পর বাদকদল ট্রাম্পেটে নোবেল পুরস্কৃতদের আগমন বার্তা ঘোষণা করলো। সারা হলের সমস্ত লোক উঠে দাঁড়ালেন, রাজা-রাণী সহ। সারিবদ্ধভাবে মঞ্চে প্রবেশ করলেন ১৯৭৭ সালের পুরস্কৃতরা। এই সারিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো দু'জন তরুণ ছাত্র—সুইডেনের অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত বিশেষ সাদা টুপিতে তাদের ছাত্রত্ব বোঝা যাচ্ছিল। এর দ্বারা আবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো আজকের সম্মান জ্ঞানীর প্রতি সম্মান। একে একে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন পদার্থবিদ্যায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ভ্যান ব্লেক, স্যার নেভিল মট, ফিলিপ এন্‌ডারসন ; তারপর রসায়নের ইলিয়া প্রিগেজীনি ; চিকিৎসা ও শারীরবিদ্যার রোজালীন ইয়ালো, রোজার গুলমিন ও এনড্রু শ্যালী ; অর্থনীতির বার্টিল ওহলিন ও জেম্‌স মীড। সাহিত্যের পুরস্কারপ্রাপ্ত স্পেনের কবি ভিচেন্‌তে আলেকজান্দ্রে অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি। আর শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেয়া হচ্ছিল একই সময়ে নরওয়ের অস্‌লোতে—এটাই নিয়ম। পুরস্কৃতরা আসছিলেন আর বাদকদল বাজিয়ে চলেছিলেন বীরবরন-সূচক সঙ্গীত। যতক্ষণ না তাঁরা আসন গ্রহণ করলেন ততক্ষণ রাজাসহ সবাই দাঁড়িয়ে রইলেন। আজকে তাঁরাই সম্মানীয়।

প্রথমে বললেন নোবেল ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর সুনে বের্গস্ট্রউম। সুইডিশ ভাষাতেই বললেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে বিশ্বের সামনে নূতন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলো তিনি তুলে ধরলেন, বিশেষ করে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের কথা। তিনি শেষ করলেন এই বলে: "নোবেল উৎসব যেন আনন্দের উৎসব হিসেবে, ভবিষ্যতের উপর আমাদের আস্থার উৎসব হিসেবে বজায় থাকে। সাথে সাথে এটা যেন মানুষের প্রচণ্ড ক্ষমতার কথা, এই পুরস্কারপ্রাপ্তরা মানুষের যে অতুলনীয় সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; তাকে যেন আমরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, সাবধানতার সাথে আমাদের শিক্ষায় ও কর্মে প্রয়োগ করি।"

পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কৃতদের উপস্থাপিত করলেন সুইডিশ রয়্যাল একাডেমীর সদস্য প্রফেসর পার-ওলভ লউডিন। চৌম্বক ও বিশৃঙ্খল ব্যবস্থার ইলেকট্রনিক গঠন সম্বন্ধে মৌলিক আবিষ্কারের জন্য এবার এই পুরস্কার পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান ব্লেক ও এনডারসন্ এবং ব্রিটেনের স্যার নেভিল মট। লউডিনের ভাষায় ব্যালে নৃত্যের নায়ক যেভাবে দৃঢ় হাতে ব্যালেরিনাকে তুলে নিয়ে বেড়ায় তেমনি রক্তের হিমোগ্লোবিনে লোহার পরমাণু অক্সিজেনের অণুকে শরীরের প্রয়োজনীয় জায়গাসমূহে পৌছে দেয়। এই ধরনের ঘটনার মূল তত্ত্বটা ভ্যান ব্লেকই প্রথম আবিষ্কার করেছেন। এনডারসন দেখিয়েছেন কাঁচের মতো আণবিকভাবে বিশৃঙ্খল বস্তুর জগতেও নিজস্ব আইন-কানুন আছে। সেখানে বিশৃঙ্খলতার রাজ্যে 'ইলেকট্রন নৃত্যে'র ফলে এমন সব সুশৃঙ্খল স্থানীয় অবস্থা সৃষ্টি হয় যা বস্তুর গুণাগুণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে সক্ষম। নেভিল মটের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটিও এখানেই। বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রনে, ইলেকট্রনে ভাব-বিদ্বেষের ঘটনা নিয়ে 'মট এনডারসন' তত্ত্ব জানা বস্তুকে বুঝতে ও নূতন গুণ সম্পন্ন অজানা বস্তুর সৃষ্টিতে মৌলিক গুরুত্বের দাবীদার। বিজ্ঞানীত্রয় দাঁড়িয়ে তাঁদের উপস্থাপন পর্ব শুনলেন। এটা সুইডিশ ভাষাতে হলেও শেষ বাক্যে ইংরেজীতে তাঁদেরকে মহামান্য

রাজার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণের অনুরোধ জানানো হলো। সঙ্গীতের আবহের মধ্যে একে একে এগিয়ে এলেন তাঁরা, রাজাও অনেকখানি এগিয়ে এসে পুরস্কার তুলে দিলেন হাতে, জানালেন অভিনন্দন। নোবেলের প্রতিকৃতি খচিত পদক ও পুরস্কারপত্র। প্রতিবার কয়েক মিনিট ধরে প্রবল হর্ষধ্বনি।

এরপর রসায়নের পুরস্কার নেবার পালা বেলজিয়ামের ইলিয়া প্রিগোজিনীর। তাঁর অবদান হলো তাপ-বলবিদ্যার ক্ষেত্রে। সাম্যাবস্থা থেকে অনেক দূরে রয়েছে এমন ব্যবস্থার অঋজু ও অপ্রত্যাবর্তী তাপ-বলবিদ্যা তিনি আবিষ্কার করেছেন যা ইতিমধ্যেই নানান ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। বিশৃঙ্খল অবস্থা কিভাবে জৈব পদ্ধতির মতো সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় পরিণতি লাভ করতে পারে সেটাই ছিল প্রিগোজিনীর মূল সমস্যা। তাঁকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে রয়্যাল একাডেমীর সদস্য প্রফেসর ক্লীসন বল্‌লেন "তাঁর কাজের মধ্যে এমন একটা উচ্চ সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতা রয়েছে যার জন্য তাঁকে 'তাপ-বলবিদ্যার কবি' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।"

চিকিৎসা ও শারীরবিদ্যার ক্ষেত্রে পুরস্কার নিলেন রোজালিন ইয়ালো. রোজার গুলেমিন, এনড্রু শ্যালী—তিনজনই যুক্তরাষ্ট্রের। জীবদেহে অতি সামান্য পরিমাণ হরমোনের অবস্থিতি যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের সৃষ্টি করতে পারে তা অভাবনীয়। এতো অল্প পরিমাণ জিনিস কিছুতেই মাপা যেতো না বলে এদ্দিন হরমোন জিনিসটা একেবারে রহস্যাবৃত ছিল। তাদের পরিমাপ ব্যবস্থার আবিষ্কার এদের বুঝতে এবং এদের কর্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করতে অনেকখানি সহায়তা করছে। উল্লিখিত তিন জন বিজ্ঞানী এই সাফল্যের দিকপাল। রোজালিন ইয়ালো রক্তের মধ্যে প্রোটিন হরমোন উদঘাটনের ব্যবস্থা করে মানব দেহে নিবৃত্তিকারক 'এন্টিবডি' সৃষ্টির ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন। গভীর মানসিক আবেগের ফলে অনেক সময় হরমোন প্রভাবিত কিছু শারীর প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন দেখা দেয়। মস্তিষ্কের মধ্যে এমন কিছু রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হয় যা রক্তবাহিত হয়ে পিটিউটারি গ্রন্থিতে পৌঁছে বিভিন্ন হরমোনের পরিমাণ

নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু কি সেই দ্রব্য যা মানুষের আবেগতাড়িত অনুভূতিকে শারীরিক প্রক্রিয়ায় পরিণত করে? গুলেমিন ও শ্যালী সেটাই আবিষ্কার করেছেন—দেহ ও মনের মধ্যেকার সেই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ বস্তুটিকে।

সাধারণতঃ নোবেল পুরস্কারের জগৎটা এতো বেশী পুরুষ প্রধান যে এবার এতে মহিলা বিজ্ঞানী রোজালিন ইয়ালো যথেষ্ট চাঞ্চল্য ও কৌতূহলের সৃষ্টি করেছেন। আমেরিকার নামজাদা ডিজাইনারের বিশেষভাবে তৈরি সুন্দর বেগুনী রঙের পোশাকে তিনি তাঁর এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে আরো বেশী ফুটিয়ে তুলেছিলেন নোবেল উৎসবে।

স্পেনের কবি ভিচেনতে আলেকজান্দ্রে সাহিত্যের পুরস্কার নিতে আসতে পারেননি। বহুদিন যাবৎ, বলতে গেলে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য। ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণের মুখে তাঁর পরিচিত জগত তখন ছারখার হয়ে গেছে। বন্ধু কবি লোরকা নিহত, অনেকে জেলে মারা পেছেন, বাকীরা দেশত্যাগী। আলেকজান্দ্রে কিন্তু রয়ে গেছেন এই অসহ্য পরিবেশে: ফ্যাসিস্ট আমলকে অতিক্রম করেছেন দেহ ও মনে। তাঁর কবিতা এই দীর্ঘ কালরাত্রিতে স্পেনের আত্মাকে যেন বাঁচিয়ে রেখেছে। সে কথার স্মরণ নেয়া হলো নোবেল উৎসবে। তাঁর হয়ে পুরস্কার নিলেন তাঁর এক তরুণ বন্ধু।

আলফ্রেড নোবেলের উইলে অর্থনীতির উপর কোন পুরস্কার দেয়া হয়নি। কিন্তু গত কয়েক বছর ব্যাঙ্ক অব সুইডেনের সৌজন্যে নোবেল পুরস্কারের সমমান ও মর্যাদার নোবেল স্মরনিকা পুরস্কার অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এবারকার অর্থনীতির পুরস্কার পেলেন সুইডেনের বার্টিল ওহলিন ও ব্রিটেনের জেমস মীড। তাঁরা পুরস্কার পেলেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক পুঁজি চলাচলের ক্ষেত্রে তাঁদের দিকদর্শক কাজের জন্য। ওহলিন দেখিয়েছেন যে পণ্যের বাণিজ্য প্রকারান্তে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহ চলাচলের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। সুদের হার ও মুদ্রানীতির যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব

আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যের উপর দেখা দেয় জেমস মীড তার বিশ্লেষণ করেছেন।

অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার প্রদানের সঙ্গে নোবেল উৎসবের এই পর্যায় শেষ হয়ে গেলো। শেষবারের মতো উঠে দাঁড়ালেন সুইডেনের রাজা আর উপস্থিত সবাই। বাজানো হলো সুইডেনের জাতীয় সঙ্গীতের সুর 'প্রাচীন তুমি, মুক্ত তুমি'। কনসার্ট হুসেটের বাইরে যখন সবাই এলেন ডিসেম্বরের স্টকহোলমের অতিহ্ব দিন তখন শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু রাতের নোবেল উৎসব তখনো বাকী। পুরস্কৃতদের সম্মানার্থে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভোজসভা ও বলনৃত্যের পার্টি এই অনুষ্ঠানের অংশ। পার্টিতে রাজা স্বয়ং হাত ধরে নিয়ে গেলেন নোবেল বিজয়ী রোজালিন ইয়ালোকে। এবারে বলনৃত্য শুরু করলো একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী। তারপর পুরস্কৃতরা ও অন্যান্যরা যোগ দিলেন এতে। অভ্যাগতরা ছাড়াও স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত আনন্দময় ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত সম্বর্ধনায় স্নাত হলেন এবারকার নোবেল পুরস্কার বিজয়ীরা।

কিন্তু আর এক ধরনের সম্বর্ধনা তাঁদের জন্ত অপেক্ষা করছিল পরদিন উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ে। উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় সুইডেনের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাপীঠ। এই বছরই এই বিশ্ববিদ্যালয় তার পাঁচশততম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করলো বৎসরব্যাপী নানা অনুষ্ঠান ও সমাবেশের মাধ্যমে। নোবেল বিজয়ীদের অনেকে বরাবর এখানে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তাঁদের গবেষণাকর্মের কথা বলেন পুরস্কার গ্রহণের পরপরই। এবার সবচেয়ে মজার বক্তৃতা দিলেন পদার্থবিদ ভ্যান ব্লেক। অর্ধশতাব্দীর উপর ধরে তিনি গবেষণা করে আসছেন বিশেষ করে সলিড স্টেট পদার্থবিদ্যায়। বয়সের ভারে ন্যুব্জ দেহ—কিন্তু এখনো উৎসাহে ভরপুর। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্য থেকে এক সময় বের হয়ে এসে তিনি তাঁর রসময় ভাষায় বললেন 'অক্সিজেন অণুর চৌম্বক কেইস হিস্ট্রি'—এই বিষয়ের উপর। এর আর একটি ঘরোয়া শিরোনামও তিনি দিয়ে রাখলেন—'অক্সিজেন অণুর সাথে

আমার পাঁচ সাক্ষাতের কাহিনী'। প্রতিটি গবেষণার সাথে জড়িত বিভিন্ন সহকর্মী, ছাত্র, বিভিন্ন টুকরো ঘটনার কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ছিলো। পাঁচ সাক্ষাতের একটি ঘটেছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন তিনি বায়ুমণ্ডল কর্তৃক রেডিও তরঙ্গ শোষণের ব্যাপারটি নিয়ে সামরিক গুরুত্ব-পূর্ণ গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে যে সব ফলাফল, গ্রাফ ইত্যাদি তিনি দেখাচ্ছিলেন তার উপর বড় বড় হরফে 'অত্যন্ত গোপনীয়' কথাটা লেখা ছিলো।

ব্যক্তিগতভাবে ভ্যান ব্লেক ও এনডারসনের সাথে কাছে থেকে আলাপ করার সুযোগ মিললো ঐদিন বিকেলে যখন উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার তাঁদেরকে একটা ঘরোয়া চায়ের দাওয়াত দিলো। চায়ে চুমুক দিতে দিতে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক অনেক আলাপ করছিলেন ভ্যান ব্লেক ও এন্ডারসন। সদাহাস্য ভ্যান ব্লেক এক পর্যায়ে বললেন "বাংলাদেশে কখনো যাইনি; তবে দার্জিলিং-এ গিয়েছিলাম একবার বহুদিন আগে। সেটি বোধ হয় বাংলাদেশ থেকে খুব দূরে নয়। সেই যে অদ্ভুত ছোট ট্রেন পুরানো আমলের স্টিম ইঞ্জিনের টানে খাড়া চড়াইতে উঠে যায় 'ঘুম' স্টেশন থেকে...।" নানান রকম প্রশ্নে ক্রমেই প্রসঙ্গ পাল্টাচ্ছিলো। নোবেল পুরস্কার কি দুবার পাওয়া সম্ভব? আগে কে কে পেয়েছেন? মাদাম কুরী, লিনাস পলিং, আর কেউ? এনডারসন তো বেশ বয়োকনিষ্ঠ, তিনি চেষ্টা করুন না কেন। এবার সব তাত্ত্বিকরা পদার্থবিদ্যায় পুরস্কার পেলেন। তাত্ত্বিকদের সাথে পরীক্ষণবিদদের মুখ দেখাদেখি ক্রমেই কমে যাচ্ছে না কি? তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ কি? ভারতীয় বিজ্ঞানকে কোন দলে ফেলবেন? ঐ সময়ে বা পরিবেশে খুব গভীর কোন আলোচনা যে সম্ভব ছিলো তা নয়, সব কথা হালকাভাবেই হচ্ছিলো। তবে বড় কথা হলো আমরা কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের মধ্যে পেয়েছিলাম জ্ঞানের রাজ্যের দু'জন সম্মানিত নায়ককে। তাঁদের মাধ্যমে নোবেল উৎসব পৌঁছে গিয়েছিলো আমাদের একান্ত কাছে।

১৯৭৮

দর্শনের বৈজ্ঞানিক পটভূমি

প্রবন্ধের নামটি দেখে মনে হতে পারে এতে কিছু একটা ভুল আছে; হয়তোবা বলতে চাওয়া হয়েছিল বিজ্ঞানের দার্শনিক পটভূমি। বিজ্ঞানের দর্শন, রাজনীতির দর্শন, শিক্ষার দর্শন ইত্যাদিতেই আমরা অভ্যস্ত। দর্শনটা যেন শুধু এক একটা দৃষ্টিভঙ্গি—ধ্যানের মাধ্যমে যা পাওয়া যায়, অন্য সব কিছুকে কিভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মেলানো যায় সেটাই সমস্যা। দর্শনের এ ধরনের সংজ্ঞা এক সময় শুধু সাধারণ মানুষ নয়, দার্শনিকরা নিজেরাও বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আজকাল তাঁরা তা করেন না। মনে হয় আমাদের দেশের চিন্তারাজ্যে ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট নয়।

ভুল ধারণাটির উৎপত্তি হলো এখনো আমরা দর্শন বলতে যে জিনিসটা বুঝি তা হলো ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে যাকে বলতে হয় মেটাফিজিক্স। অর্থটা সব সময় পরিষ্কার রাখার জন্য আপাতত বাংলায় একে আমরা বলব 'বিজ্ঞানোত্তর চিন্তা'। এটা দাবি করে শুধু চিন্তা ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নূতন জ্ঞান সৃষ্টি সম্ভব, অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষার কোন তোয়াক্কা না রেখেও। শুধু তাই নয়, যেখানে এ ধরনের চিন্তা-লব্ধ জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে মিলবে না সেখানেও একেই বিশ্ব-দর্শনের ভিত্তি করতে হবে। কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তুলনায় এটা শুদ্ধ, অমলিন ও উচ্চতর জ্ঞান। অতীতে দার্শনিকরা এতে বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁদের দর্শনে সাধারণ জীবন ও বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যার অনেক মূল্যবান প্রয়াস থাকলেও শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানোত্তর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পাল্লায় পড়ে এসব আর খুঁজে পাওয়া যেত না। স্বাভাবিকভাবে

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে গত দু'তিন শ বছর ধরে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানোত্তর চিন্তার দাবিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। তার ফলে আজকের দুনিয়ার প্রধান প্রায় সবগুলো দার্শনিক মতবাদ বিজ্ঞানোত্তর চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করে, বিশেষ করে তা যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে জ্ঞান সৃষ্টির ও সত্য প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে আসে। বর্তমান প্রবন্ধের এটাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অতীতের চ্যালেঞ্জগুলোকে কিছুটা অনুসরণ করে আমরা দেখব দর্শনে মূল প্রশ্নগুলো কি এবং তার উত্তর কোন্ দিক থেকে আসতে পারে। তারপর সেই সূত্র ধরে আধুনিক দর্শনের প্রধান কয়েকটা মতবাদের মূলনীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে আজকের দর্শনের পটভূমি ও ভিত্তি প্রধানত বৈজ্ঞানিক। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যৌক্তিক শৃঙ্খলা ও সমন্বয় সাধন করে একীভূত বিশ্ব-দর্শন সৃষ্টি করাই এর প্রধান কাজ। ফলে আধুনিক বিজ্ঞানে নিলিপ্ত থেকে শুধু ধ্যানে বসে কালোপযোগী দর্শন সৃষ্টি সম্ভব নয়। আর বিজ্ঞানীও যখন বিজ্ঞান চর্চা করছেন তখন তিনি আধুনিক দর্শন থেকে মুক্ত নন, বরং এরই পটভূমি তিনি সুপ্রসারিত করছেন।

ঠিক কোন্ জায়গায় এসে দার্শনিকরা বিজ্ঞানোত্তর চিন্তার দাবি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে আরম্ভ করেছেন তা বলা মুশকিল। সেই ঐতিহাসিক বিতর্কে না গিয়ে ইমানুয়েল কাণ্টের দর্শনকে আমাদের আলোচনার প্রারম্ভ হিসেবে ধরে নিতে পারি। কাণ্টের দর্শনকে সাধারণত বলা হয় সমালোচনামূলক দর্শন (critical philosophy)। এর কারণ আগেকার সব দর্শনকে কাণ্ট সুশৃঙ্খল সমালোচনার সম্মুখীন করে দর্শনের মূল বিষয়গুলোকে পরিষ্কারভাবে আলাদা করে নিয়েছেন। এজন্যই প্রারম্ভ হিসেবে কাণ্ট সুবিধাজনক। কাণ্টের সমালোচনায় শুদ্ধ বিজ্ঞানোত্তর চিন্তাকে (speculative metaphysics) দর্শন থেকে নির্বাসন দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাঁর মতে অভিজ্ঞতা ও বাস্তব পরীক্ষার ঊর্ধ্বে উঠে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে রায় দেবার অধিকার দার্শনিকের নেই; কারণ ওরকম ঊর্ধ্বে উঠে বসার কোন জায়গাই নেই। চিন্তাকে

পাশানক হতে হলে বার বার একে ফিরে এসে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করে নিতে হবে।

কাণ্ট সমস্ত সম্ভাব্য জ্ঞানের কতকগুলো শ্রেণীবিভাগ করেছেন যা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় খুব কাজে আসবে। সব জ্ঞানকে এক দিকে অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) ও স্বতঃলব্ধ (apriori) এই দুইভাগে, অন্যদিকে বিশ্লেষণমূলক (analytic) ও সংশ্লেষণমূলক (synthetic) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে যত জ্ঞান আমরা লাভ করি তা সবই অভিজ্ঞতালব্ধ। তাপ দিলে পানি ফুটে এটা এ ধরনের জ্ঞান। পানি ফুটিয়ে দেখার আগে এটা আমাদের জানা থাকতে পারে না। কিন্তু কিছু জ্ঞান আছে যেগুলো স্বতঃলব্ধ—এদের জানার জন্য কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। 'ক যদি খ এর সমান হয় আর খ যদি গ এর সমান হয় তাহলে ক, গ এর সমান।' এই কথাটি জানার জন্য ক আর গ কে মাপজোপ করতে হয় না। এটা স্বতঃলব্ধ। জ্ঞানগুলো আবশ্যক জ্ঞান (necessary), এরা সত্য না হয়ে পারেনা। অপর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালব্ধ একটি বিশেষ ঘটনা সত্য না হলেও চলত। পানি যদি না ফুটত তা হলে এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অন্য রকম হত বটে, কিন্তু সব কিছু ধ্বসে পড়ত না, কিন্তু উপরের সমতার নিয়ম সত্য না হলে বিপদ।

কাণ্টের দ্বিতীয় বিভাগ-পদ্ধতিটি একটু অন্য রকমের। বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানে সত্যিকার নূতন কোন জ্ঞান থাকে না। প্রস্তাবনাটির (proposition) এক অংশকে বিশ্লেষণ করলে অন্য অংশ এমনিতেই পাওয়া যায়। যেমন, উপরের উদাহরণে 'ক খ এর সমান' আর 'খ গ এর সমান' এইটুকু বলার ভেতর বাক্যের বাকি অংশের (ক, গ এর সমান) সত্যতা নিহিত রয়েছে। এর জন্য বাইরের দুনিয়ায় কোন সত্যিকার ক, খ, গ-এর অস্তিত্বেরই প্রয়োজন নেই। বাক্যের প্রথম অংশ বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয় অংশ পাওয়ার মাধ্যমে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হল বটে, কিন্তু এর

দ্বারা নূতন কোন জ্ঞান পাওয়া গেল না যা আগে জানা ছিল না। অপর পক্ষে সংশ্লেষণমূলক জ্ঞান মাত্রই নূতন জ্ঞান। 'সব বস্তুর ওজন আছে' এই জ্ঞানটি সংশ্লেষণমূলক। কারণ 'সব বস্তু' বললেই তাদের যে 'ওজন আছে' সে কথা স্পষ্ট হয় না, বাক্যের বাকি অংশও আলাদাভাবে জানতে হয়। এক্ষেত্রে বস্তুর ধারণা ও ওজনের ধারণা এ দু'টার সংশ্লেষণের মাধ্যমে নূতন জ্ঞান পাওয়া যাচ্ছে।

এভাবে শ্রেণীবিভাগের পর কাণ্ট দেখলেন আমাদের পরিচিত জ্ঞানগুলো কোন্‌টা কোথায় পড়ে। এটা করতে গিয়ে তিনি কতকগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা আধুনিক দর্শন মানতে পারে না। তিনি বললেন, কতগুলো জ্ঞান আছে যা স্বতঃলব্ধ অথচ সংশ্লেষণমূলক অর্থাৎ নূতন জ্ঞান। গণিতের ও পদার্থবিদ্যার অনেক কিছুকে তিনি এর মধ্যে ফেললেন। যেমন, কার্য-কারণ সম্পর্ক (causality) এটা স্বতঃলব্ধ, অথচ নূতন জ্ঞান। তাছাড়া তিনি বললেন যে, ত্রিমাত্রিক স্থানে (three dimensional space) সব কিছু অবস্থিত এর জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ নয় স্বতঃলব্ধ, এটা আমাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত। রঙীন চশমা পরে সবকিছু রঙীন দেখার মত আমাদের পক্ষে সব কিছু এই ত্রিমাত্রিক স্থানে দেখা ছাড়া উপায় নেই। তাঁর সময়কার নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এটা কাণ্টের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তখনো এগুলোকে অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ করা যায়নি।

কাণ্টের দর্শনে আরেকটা প্রধান বিষয় হল 'অভিজ্ঞতায় জিনিস' (phenomenon) আর অন্তর্নিহিত জিনিস (thing in itself) এ দু'টাকে আলাদা করে দেখা। একটা জিনিস সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে পারি শুধু এর সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়লব্ধ সব তথ্য থেকে—একে দেখে শুনে বা ছুঁয়ে সরাসরিভাবে, অথবা কোন পরোক্ষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে। কাজেই জিনিসটি আমাদের কাছে অভিজ্ঞতার জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। এর বাইরে আমরা এ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি না। কিন্তু কাণ্টের মতে এই অভিজ্ঞতার জিনিসের পেছনে লুকানো থাকে অন্তর্নিহিত

জিনিস যার থেকে অভিজ্ঞতার উৎপত্তি হয়। একে জানা অসম্ভব, তবে এ সম্বন্ধে চিন্তা করা চলে। শুধু বিজ্ঞানোত্তর জ্ঞানে বিশ্বাসীরাই একে জানার আশা করতে পারেন। পরে আমরা দেখব অভিজ্ঞতার জিনিস ও অন্তর্নিহিত জিনিসের অস্তিত্ব ও পার্থক্যকরণ নিয়ে আধুনিক দর্শনে কি পরিমাণ সমস্যা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

কাণ্টের আরেকটি প্রধান বিষয় হলো তাঁর ন্যায়নীতি (Ethics)। আগেকার বেশীর ভাগ দার্শনিক ন্যায়নীতিটা ধর্মের অনুশাসনের ঘাড়ে চাপিয়ে খালাস পেয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞানোত্তর চিন্তা বিবর্জিত কাণ্টের দর্শনে তা সম্ভব ছিল না। কাণ্টের মতে ন্যায়নীতিকে সত্যিকার জ্ঞানের (factual knowledge) ভেতর বাঁধা সম্ভব নয়, এর অবস্থান তার বাইরে। আমাদের চিন্তাজগতের পরীক্ষাই আমাদেরকে ন্যায়নীতি সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। ন্যায়-অন্যায়বোধ একটা স্বায়ত্তশাসিত এলাকা। কোন বিশেষ ফল লাভের জন্য বা উপকারিতার জন্য এর প্রয়োজন নয়, নিজের মধ্যেই এর সার্থকতা। এ সম্পর্কে কাণ্টের মত সব আধুনিক দার্শনিকের কাছে সন্তোষজনক মনে হয় না।

দার্শনিক সমস্যাগুলো খুব ব্যাপক ও সুশৃঙ্খলভাবে তুলে ধরা হয়েছে বলে কাণ্টের দর্শন থেকে আলোচনা শুরু করার সুবিধা আছে। কিন্তু দর্শনের নানা বিষয়ে আধুনিক মতামতের খুব কাছাকাছি পূর্বসূরীকে খুঁজতে হলে আমাদেরকে সময়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে ডেভিড হিউমের দর্শনে চলে যেতে হবে। তিনিও তৎকালীন বিজ্ঞানোত্তর চিন্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন। তবে তাঁর লক্ষ্য ছিল আরো সুদূরপ্রসারী। কাণ্টের মতো তিনি কোন স্বতঃলব্ধ জ্ঞানে বিশ্বাস করতেন না। বরং তাঁর মতে সমস্ত জ্ঞানই পরীক্ষালব্ধ, শুধু বিভিন্ন জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক-টুকুই স্বতঃলব্ধভাবে জানা যেতে পারে। হিউম ও তাঁর কাছাকাছি সময়ের আরো কয়েকজন খ্যাতনামা ব্রিটিশ দার্শনিক বার্কেল, লক প্রমুখ সবাই পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন, যার জন্য তাঁদের সবার দর্শনকে একসাথে ব্রিটিশ পরীক্ষাবাদী দর্শন (British empiricist philosophy)

বলে অভিহিত করা হয়। আজকের দুনিয়ার কয়েকটি প্রধান দার্শনিক গোষ্ঠী এঁদেরই সাক্ষাৎ উত্তরসূরী। এঁদের মধ্যে হিউমই ছিলেন সবচেয়ে আপোষহীন। কার্য-কারণ সম্পর্কের ধ্রুব সত্যতা নিয়ে তিনিই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ উত্থাপন করেন, আজকের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-দর্শন অনেকাংশে যার স্বীকৃতি দেয়। তাঁর ন্যায়নীতির ভিত্তিও কাণ্টের মত কোন স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় নয়, বরং তাঁর মতে ন্যায়-অন্যায় ও মূল্যবোধের মূলে রয়েছে মানুষের প্রকৃতি ও তার সুখ-দুঃখের অনুভূতি। পরে আমরা দেখব এসব বিভিন্ন বিষয়ে হিউমের দর্শন আধুনিক দর্শনের কত কাছাকাছি।

এরপর আমরা চলে যাব বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে, অগাস্ট কোঁতের কাছে। আর সব বাদ দিলেও দু'টি খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও ধারণার জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী। এর একটা হল পজিটিভিজম (Positivism) অন্যটা হল সোশিওলজী (Sociology)। আজকের অনেক দার্শনিক নিজেদেরকে 'পজিটিভিস্ট' বলে আখ্যা দেবেন, অনেকে আবার পজিটিভিস্ট গোষ্ঠীর সাথে সব সম্পর্ক অস্বীকার করবেন। কিন্তু খুব সূক্ষ্ম দার্শনিক গোষ্ঠী হিসেবে না দেখে এর মূল চেতনাটি যদি দেখি তা হলে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখব আজকের প্রধান ও বেশীর ভাগ দর্শনের এটাই মূল সুর। কোঁতে দেখিয়েছেন মানুষের-জ্ঞান-লাভ পদ্ধতি প্রথমে অন্ধ-বিশ্বাস, তারপর বিজ্ঞানোত্তর চিন্তা—এই দুই কানাগলিতে হাতড়ের শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক' হয়েছে যেখানে বৈজ্ঞনিক সাক্ষ্য ছাড়া কোন জ্ঞানকে সে গ্রহণ করতে পারে না। একেই তিনি বলেছেন পজিটিভ জ্ঞান। কাজেই পজিটিভিজমকে আমরা বাংলায় বলতে পারি বিজ্ঞান বাদ, তবে Scientism নামক আরেকটা জিনিসের সাথে ভুল বোঝা-বুঝি হতে পারে বলে একে আমরা বলব নির্ণয়নবাদ। সাধারণভাবে নির্ণয়নবাদীরা বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞান যতখানি নির্ণয় করতে পারে যতখানি নিশ্চয়তা দিতে পারে ততখানিই আমাদের জ্ঞানের ও অর্থপূর্ণ প্রশ্নের সীমা। এর বাইরে কোন জ্ঞান বা নিশ্চয়তা দাবি করা সম্ভব

নয়। এই নির্ণয়নবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোঁতে দেখালেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নির্ণয়নবাদ যে রকম প্রশ্নের অতীত সেরকম মানব-সমাজ সম্বন্ধেও সত্যিকার জ্ঞান লাভ করতে হলে একেও বিজ্ঞান ও নির্ণয়নবাদের আওতায় আনতে হবে। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক সমাজ-পাঠেরই তিনি নাম দিলেন সোশিওলজী বা সমাজবিজ্ঞান। কোঁতেকে তাই আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর বহু গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিককেই সাধারণভাবে নির্ণয়নবাদী আখ্যা দেওয়া চলে। আমরা শুধু এর মধ্যে অষ্ট্রিয়ান দার্শনিক আর্ণস্ট মাখের দর্শনটি আলোচনা করব। মাখ নিজে উঁচুদরের বিজ্ঞানী ছিলেন এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানের দর্শনে তাঁর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পুরো দর্শন পরবর্তীকালের চিন্তাধারায় প্রচুর প্রভাব রেখেছে। কিন্তু মাখের ও পরবর্তী অন্যান্যের দর্শন আলোচনা করার আগে আমাদেরকে আবার পিছিয়ে গিয়ে আরেকজন ব্রিটিশ পরীক্ষাবাদী বার্কেলের মূল দর্শনটি দেখতে হবে। বার্কেল বিশ্বাস করতেন বস্তুর অবস্থিতি শুধু অভিজ্ঞতায়। আমার সামনের এই টেবিল, কাগজ, কলম, ঘরের দেয়াল সব কিছু আছে, কারণ, আমি সেগুলো দেখছি, ছুঁয়ে অনুভব করছি। আমার ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনার বাইরে তার কোন অস্তিত্ব নেই। এভাবে সবকিছুকে অভিজ্ঞতায় পর্যবেক্ষিত করে যে দর্শন তাকে বলা হয় অভিজ্ঞতাবাদ (Phenomenalism)। এখানে বার্কেল একটা মুশকিলে পড়লেন। চেতনার বাইরে যদি টেবিলের অস্তিত্ব না থাকে তা হলে আমি যখন ঘর থেকে বের হয়ে যাব তখন কি টেবিলের অস্তিত্ব লোপ পাবে? একে বলা যেতে পারে আত্মসর্বস্বতার সমস্যা (Solipsism) বার্কেল এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বললেন. ঘরে কেউ থাক বা না থাক, টেবিলটা সব সময় সৃষ্টিকর্তার চেতনায় রয়েছে, কারণ তিনি সব সময় সব কিছুকে পর্যবেক্ষণ করছেন। বলা বাহুল্য, সমাধানটি সন্তোষজনক নয়।

বার্কলের মত মাখও মূলত অভিজ্ঞতাবাদী। তাঁর নিজের

ব্যবহৃত একটা উদাহরণ থেকে তাঁর মতামতটা বোঝা যেতে পারে। একটা পেন্সিলকে বাতাসে রেখে দেখা গেল এটা সোজা, কিন্তু পরক্ষণে পানিতে ডুবিয়ে দেখা গেল এটা বাঁকা। আমরা বলি পেন্সিলটা আসলে সোজা, কিন্তু পানির মধ্যে রাখাতে বাঁকা দেখায়। কিন্তু প্রথমটাকে আসলের সম্মান দিয়ে দ্বিতীয়টাকে দেখার ভুল মনে করার কি যৌক্তিকতা আছে? মাখের মতে কিছুই নেই। পেন্সিলের সব কিছুই আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে। এই অভিজ্ঞতার পেছনে 'আসল পেন্সিল' বলে আলাদা কোন জিনিস নেই। আমরা শুধু প্রত্যেক অবস্থায় পেন্সিলের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে পারি। এই বর্ণনা দেয়া হলেই সব প্রশ্ন ফুরিয়ে যায়। উপরের উদাহরণে যা সত্য তা হলো, বাতাসে রাখলে পেন্সিলকে দেখতে সোজা দেখায় ধরতেও সোজা মনে হয়। পানিতে রাখলে পেন্সিলকে দেখতে বাঁকা মনে হয় কিন্তু ধরতে সোজা মনে হয়। কেউ যদি পানিতে পেন্সিল দেখে বলে বসে 'পেন্সিলটি বাঁকা' তা হলে ভুলটি শুধু পুরো ঘটনা না বলার মধ্যে, পেন্সিল যে পানির মধ্যে সে কথাটা চেপে যাওয়ার মধ্যে। তাই মাখের মতে বিজ্ঞানের কাজ হল অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণতা দেয়া (completion of experience)। বার্কলের আত্মসর্বস্বতার সমস্যা এড়াবার জন্য তিনি 'আমার অভিজ্ঞতা' না বলে বললেন, 'আমাদের অভিজ্ঞতা।' যুক্তি হিসেবে তিনি বললেন, যেহেতু তোমার দেহ স্নায়ুতন্ত্রী ইত্যাদি আমার দেহ, স্নায়ুতন্ত্রী ইত্যাদির অনুরূপ, কাজেই তোমার অভিজ্ঞতা ও আমার অভিজ্ঞতা এক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। এভাবে সার্বজনীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বস্তুকে খাড়া করলেন। মাখ তৎকালীন পদার্থবিদ্যার যান্ত্রিক (mechanistic) ব্যাখ্যার তীব্র সমালোচনা করেন। অণু-পরমাণুর অন্তর্নিহিত অস্তিত্ব অর্থাৎ এরা মার্বেল বা টেনিস বলের মত একটা কিছু একথা তিনি মানতে পারেন না, কারণ অভিজ্ঞতা তা মানতে বাধ্য করে না। তাছাড়া নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় স্থানের (space) যে সব ধ্রুব গুণাগুণ ধরে নেয়া হয়েছিল মাখ তারও সমালোচনা করেন।

আধুনিক পদার্থবিদ্যার কতকগুলো আবিষ্কার মাখের দর্শনকে গুরুত্ব দিয়েছে। আইনস্টাইন নিজে আপেক্ষিক তত্ত্বের আবিষ্কারে মাখের ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বে পরম ব কাগুলো বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কণিকার মত আবার বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তরঙ্গের মত ব্যবহার করে। এগুলো 'সত্যিই কি' এ প্রশ্ন পদার্থবিদ্যা অবান্তর মনে করে—বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এর ব্যবহারের বর্ণনা দেয়ার অতিরিক্ত এটা কিছু করতে পারে না। বিজ্ঞানের এই রূপ মাখের দর্শনের খুব কাছাকাছি। মাখ ও তাঁর সমমতাবলম্বীদের দর্শনকে সাধারণত অভিজ্ঞতা-সমালোচনা (empirio criticism.) বলে অভিহিত করা হয়।

বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের মুহূর্তে দর্শনের ক্ষেত্রে যে আরেকটি বিরাট উন্নতি সাধিত হচ্ছিল তা হল গাণিতিক যুক্তির পরীক্ষার মাধ্যমে লজিক বা যুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন। গাণিতিক শৃঙ্খলা ও সাঙ্কেতিক মিত-ব্যয়িতার আমদানি করে যুক্তিবিদ্যাকে আধুনিক দর্শনের শক্তিশালী হাতিয়ার করে তুললেন গেটলেব ফ্রেগে ও বার্ট্রাণ্ড রাসেল। বিশেষ করে এ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাসেল ও হোয়াইটহেডের বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা'র প্রকাশ আধুনিক দর্শনের একটি বিরাট পদক্ষেপ।

মাখ অন্যদের নির্ণয়নবাদী দর্শন ও রাসেল প্রমুখের নূতন যুক্তিবিদ্যার সমন্বয়সাধন করে আধুনিক দর্শনে একটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে যার প্রভাব কমবেশী আজকের সবগুলো দার্শনিক মতবাদের উপর পড়েছে। এর নাম যৌক্তিক নির্ণয়নবাদ (**logical positivism**)। এর চরম স্পষ্টবাদিতা ও প্রভাবের জন্য আমরা একে একটু বিশদভাবেই আলোচনা করব। ১৯৩০ সনের দিকে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে স্লিক, চারনাপ, নয়রাথ প্রমুখ দার্শনিককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বলে একে ভিয়েনা গোষ্ঠীও বলা হয়। আরেকজন দার্শনিক ভিয়েনা গোষ্ঠীর একজন না হয়েও এর ভাবগুরু হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন, তিনি হচ্ছেন ভিটগেনস্টাইন।

যৌক্তিক নির্ণয়নবাদের প্রথম কথা হল অতীতে দর্শন যত প্রশ্ন তুলেছে তার অনেকগুলোই অর্থহীন। এর মতে শুধু যেসব বাক্যের অর্থ আছে যার সত্য-মিথ্যা পরীক্ষার দ্বারা যাচাই হতে পারে। তক্ষুণি যাচাই হতে হবে এমন কোন কথা নেই, অন্তত ভবিষ্যতের উন্নততর উপায়ের দ্বারা যাচাই হবার মত একটা তাত্ত্বিক সম্ভাবনা থাকতে হবে। তা না হলে বাক্য অর্থহীন হতে বাধ্য। এই নিয়মকে বলা হল যথার্থতার নিয়ম (**verification principle**)। বিজ্ঞানোত্তর চিন্তার যাবতীয় জিনিস এই নিয়মে উত্তীর্ণ হতে না পেরে গোড়াতেই বাদ পড়ে যায়। কাণ্টও বিজ্ঞানোত্তর চিন্তাকে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু কাণ্টের কারণ ছিল এতে মানুষের জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করা হয় বলে। কাণ্টের কাছে বিজ্ঞানোত্তর জ্ঞান অসম্ভব কোন যৌক্তিক কারণে নয়, আমাদের জ্ঞান সম্পর্কীয় একটা সত্যের ফলে। সমালোচকরা বলবেন, জ্ঞানের সীমার অপর পার সম্বন্ধে যদি একেবারেই জানা না থাকে তা হলে সীমাটাই বা টানি কোন্ খানে। যৌক্তিক নির্ণয়নবাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি খাটে না : কারণ মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে এটা বিজ্ঞানোত্তর চিন্তাকে বাদ দিচ্ছে না। এর যুক্তি হল বিজ্ঞানোত্তর চিন্তা যে সব বাক্যে প্রকাশ করা হবে যথার্থতার নিয়ম অনুসারে সে বাক্যের কোন অর্থ হতে পারে না। আর মানুষের ভাষা মাত্রই যথার্থতার নিয়ম মানতে বাধ্য।

অতএব অর্থপূর্ণ বাক্য যথার্থ জ্ঞান হতে হলে তা অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষার মাধ্যমে আসতে হবে। কিন্তু স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের কি হবে—যেমন যুক্তিবিদ্যার বা গণিতের কথাবার্তার? 'ক যদি খ-এর সমান হয় তা হলে ক আর খ অসমান হতে পারে না,' 'দুয়ে দুয়ে চার হয়' এ ধরনের বাক্য পরীক্ষালব্ধ নয়, এরা স্বতঃলব্ধ ; দর্শনে এদেরও জায়গা চাই। এ সম্বন্ধে যৌক্তিক নির্ণয়নবাদের উত্তর হল স্বতঃলব্ধ বাক্য মাত্রই বিশ্লেষণমূলক। অর্থাৎ এগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাক্যের এক অংশের সত্যতা অন্য অংশে নিহিত আছে—এরা কথার হেরফের (**tautology**) ছাড়া আর কিছুই নয়। ক আর খ সমান এই কথাটির মানেই হল ক আর খ

অসমান নয়। চার কথাটার সংজ্ঞাই হল দুই আর দুই-এর যোগফল। কাজেই এসবে নূতন কোন কথা বলা হচ্ছে না। যুক্তিবিদ্যা বা গণিতকে কথার হেরফের বলার মানে এই নয় যে এরা ফেলনা জিনিস, বরং এরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উপরের সহজ উদাহরণের মত বিশ্লেষণটি সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। শুধু তাই নয়, যৌক্তিক নির্ণয়নবাদ দাবি করে সত্যিকার দর্শনের। শুধু এই বিশ্লেষণ নিয়েই কারবার হওয়া উচিত। কারণ এর বাইরে যত সংশ্লেষণমূলক, পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান তা বিভিন্ন বিশেষ বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে—যেমন পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি। দর্শনের নিজের কাজ শুধু বিশ্লেষণমূলক—বিভিন্ন বিজ্ঞানের সংগৃহীত জ্ঞানের যৌক্তিক শৃঙ্খলা ও সমন্বয়সাধন। এভাবে যৌক্তিক নির্ণয়নবাদের হাতে একদিকে বিজ্ঞানোত্তর চিন্তা ও অন্যদিকে বিশেষ বিজ্ঞানগুলোর কাজ থেকে মুক্ত হয়ে দর্শন শুধু বিশ্লেষণমূলক দর্শন বা বিজ্ঞানের দর্শন হিসেবে বেঁচে থাকে। দর্শনের এরকম সঙ্কীর্ণ (?) সংজ্ঞা অনেকের কাছে খুব অদ্ভুত মনে হলেও বহু বছর আগে হিউমও ঠিক এমনি কথাই বলে গেছেন। তাঁর কাছেও অর্থপূর্ণ সব কথাকে হয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নির্ভর হতে হবে নতুবা পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় কোন নীতি হতে হবে যার সত্যতা নিজের মধ্যেই নিহিত।

যৌক্তিক নির্ণয়বাদীরাও মূলত বার্কলের মত অভিজ্ঞতাবাদে (Phenomenalism) বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে বার্কলে বস্তুর বাস্তবতা কখনো অস্বীকার করেননি। তিনি যা বলছেন তা হলো বস্তু বাস্তবতা অভিজ্ঞতার বাইরে অন্তর্নিহিত কোন জিনিসের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং বস্তু সম্পর্কে ইন্দ্রিয়লব্ধ নানা অভিজ্ঞতার পরস্পর সম্পর্কের উপরই এর ভিত্তি। বার্কলের ভুলটি হল সত্যিকার অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতিতে বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করার মধ্যে—যার জন্য তাঁকে সব কিছু সৃষ্টিকর্তার নজরে রাখতে হয়েছে। ভুলটির উৎপত্তি হল, তিনি মনে করেছেন বস্তু হলো অভিজ্ঞতার সমষ্টি, কাজেই অভিজ্ঞতা ছাড়া বস্তু আসে কোত্থেকে? কিন্তু যৌক্তিক নির্ণয়নবাদীর কাছে অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বস্তু গড়ে

উঠে বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতাগুলো নিজেরা বস্তুর অংশ নয়। অভিজ্ঞতা থেকে যৌক্তিক গঠনের (logical construction) মাধ্যমে যা গড়ে উঠে তাকেই বলা হয় বস্তু। কাজেই বস্তুর অস্তিত্বের জন্য বর্তমান অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই, অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা থাকলেই যথেষ্ট। অর্থাৎ কতকগুলো পরিস্থিতি সাপেক্ষ (যেমন দৃষ্টিসম্পন্ন, সুস্থমস্তিষ্ক মানুষের উপস্থিতি) বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতালাভ সম্ভব হলে আমরা বিশেষ একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করব; এই মুহূর্তে সেই পরিস্থিতি বিরাজ করছে কিনা তা বড় কথা নয়।

উপরে যেই যৌক্তিক (logical construction) কথা বলা হল তা যৌক্তিক নির্ণয়নবাদে খুবই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে আছে। এর মতে শুধু বস্তুই নয়, যে কোন সত্যিকার জিনিসই পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নির্মিত যৌক্তিক গঠন ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে 'টেবিলটি' হল টেবিলের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়া যৌক্তিক গঠন আর 'রাষ্ট্র' হল কিছু মানুষের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়া যৌক্তিক গঠন। এভাবে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান আর যুক্তিবিদ্যার মারফত পুরো বিশ্বের দার্শনিক ছবি পাওয়া সম্ভব।

অন্য সবার মত, যৌক্তিক নির্ণয়নবাদকেও ন্যায়নীতি, মূল্যবিচার, সৌন্দর্যবিচার ইত্যাদি প্রশ্নে এসে একটু হোঁচট খেতে হয়েছে। আধুনিক দর্শনে ন্যায়নীতি সম্বন্ধে মোটের উপর দু'রকমের মতবাদ দেখা যায়—একটা হল ব্যক্তিনির্ভর (subjectivist), অন্যটা হল উপকারিতানির্ভর (utilitanian)। ব্যক্তিনির্ভর মতে ন্যায়নীতি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করবে। একটা কাজ ভাল বা মন্দ কিনা সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত সর্বজনীন না হলে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অপরপক্ষে উপকারিতা-নির্ভর মতে যে কাজের ফলাফল শেষ পর্যন্ত সুখের হয়, উপকারে আসে সেটাকেই 'ন্যায়' বলে বিবেচনা করতে হবে। এটা মোটের উপর নির্ণয়নযোগ্য। যৌক্তিক নির্ণয়নবাদীদের বেশীরভাগ এই শেষোক্ত উপকারিতা-নির্ভর ন্যায়নীতিতে বিশ্বাস করেন।

অন্য কিছু নির্ণয়নবাদী (বিশেষ করে আয়ের প্রমুখ ব্রিটিশ নির্ণয়নবাদী) আবার এই ব্যাপারে খুবই নূতন একটা মতের অনুসারী। তাঁরা বলেন, ন্যায়নীতির পুরো জিনিসটাই দর্শন বহির্ভূত ও আবেগমূলক (emotive)। 'চুরি করা মহাপাপ,—এই বক্তব্যের মধ্যে যথার্থ কোন সত্য নেই—কারণ এর সত্যতা নির্ণয়ন অসম্ভব। এতে শুধু বক্তার একটি বিশেষ আবেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। বক্তব্যটি যেন একটি বিশেষ রাগ বা ঘৃণার ভঙ্গিতে 'চুরি করা' এই কথাটি বলা অথবা বেশ কয়েকটা। চিহ্ন সহ. চুরি করা !!! লেখা। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, মানুষের ন্যায়নীতি সম্বন্ধে সমস্ত সিদ্ধান্ত ভুয়া। শুধু বলা হচ্ছে, এই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য দার্শনিকের এমন বিশেষ অধিকার নেই যা অন্যেরও নেই। স্বাভাবিক কারণেই এই মত খুবই বিতর্কিত এবং সাধারণভাবে অসমর্থিত।

যৌক্তিক নির্ণয়নবাদের সমালোচকরা সবচেয়ে তীব্রভাবে যে বিষয়টির সমালোচনা করেছেন তা হল এর একবারে গোড়ার ভিত্তিটি—যথার্থতার নিয়মের (verification principle)। যথার্থতার নিয়ম বলে অর্থপূর্ণ বাক্যকে হয় পরীক্ষালব্ধ বিষয় প্রকাশ করতে হবে অথবা কথার হেরফের হতে হবে। তাই যদি হয় তবে যথার্থতার নিয়মটা নিজেইবা অর্থপূর্ণ হয় কেমন করে? এটা তো পরীক্ষালব্ধ সত্যও নয়, কথার হেরফেরও নয়। আর এটা যদি অর্থপূর্ণ না হয় তা হলে পুরো যৌক্তিক নির্ণয়নবাদই ধসে পড়ে।

এর যে উত্তর যৌক্তিক নির্ণয়নবাদীরা দেন তা হলো, যথার্থতার নিয়ম কোন পরীক্ষালব্ধ সত্য নয়, এর নিজের যথার্থতার পরীক্ষাও অসম্ভব। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ একে একটা সংজ্ঞা হিসেবে খাড়া করা হয়েছে বিশ্বের যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বক্তব্যগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষার জন্য। এই বিষয়গুলো এমন যে সংজ্ঞাটি এভাবে না দিয়ে উপায় নেই। উত্তরে সমালোচকরা বলতে পারেন, সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের

বাইরেও তো অন্য জগৎ থাকতে পারে—যা বিজ্ঞানোত্তর দার্শনিকরা নিজেদের চিন্তা ও আলোচনার বিষয়বস্তু করতে পারেন। তাই যদি হয়, তবে সেই বিজ্ঞানোত্তর জগতেরও যথার্থতার নিয়ম থাকতে হবে এবং তা দেয়ার দায়িত্ব বিজ্ঞানোত্তর দার্শনিকের। মুশকিল হল তিনি দুই দিকেই হাত রাখতে চান। এদিকে তিনি তাঁর বক্তব্য এমনভাবে বলেন যেন এগুলো এক ধরনের বৈজ্ঞানিক সত্য, শুধু সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্যের আরো উঁচু স্তরের, আরো গভীর। অন্যদিকে যেই দেখিয়ে দেয়া হয় যে বৈজ্ঞানিক হবার কোন অধিকার এর নেই, তক্ষুণি তিনি বলেন সেটা তিনি জানেন, তাঁর খেলার অন্য নিয়ম, সেই নিয়মে সেটা সিদ্ধ। অথচ কোন দিন তিনি বলেন না কি সেই নিয়ম। কোন্ গ্রহণযোগ্যতার নিয়মে বিজ্ঞানোত্তর চিন্তার একটা সত্য হবে, অন্যটা হবে না?

আগেই বলেছি যৌক্তিক নির্ণয়নবাদ চরম ও বৈপ্লবিক মতের অনুসারী। এর প্রভাব বর্তমান প্রায় সব দর্শনের উপর প্রচুর। হিউম ও কান্টের শুধু করা কাজ যৌক্তিক নির্ণয়নবাদের আপোষহীন হাতে চরম রূপ লাভ করেছে। কিন্তু ১৯৩০ সালের দিকে ভিয়েনা গোষ্ঠী যেভাবে কড়াকড়িভাবে এই মত অনুসরণ করছিলেন আজ সবাই তা করেন না—এমনকি ভিয়েনা গোষ্ঠির পুরানো সদস্যরাও না। উদাহরণ স্বরূপ কোন বিষয় যথার্থতায় নিয়ম পালনে ব্যর্থ হলে আগে অনেকে একে শুধু দর্শন থেকে নয়, যাবতীয় অর্থপূর্ণ আলোচনা থেকেই বাদ দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এখন বেশীরভাগ নির্ণয়নবাদী একে দর্শনের বাইরে ভিন্ন এলাকায় অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিতে রাজী আছেন—যেমন কাব্যে যেখানে যথার্থতার নিয়ম পালন না করেও কোন বাক্যে এক ধরনের অর্থ লাভ করে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিতে সাহায্য করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে—'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নয়,' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মত বাক্যগুলো আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের কাব্যিক উপায়, কোন দার্শনিক বক্তব্য নয়।

যৌক্তিক নির্ণয়নবাদের একটা ফল হয়েছে যাবতীয় বিজ্ঞানের মধ্যে একটা ঐক্যের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং স্বীকার করা হয়েছে সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই পদ্ধতি মূলত এক। আপাত পার্থক্যগুলোর কারণ হল কোন কোন বিজ্ঞান ইতিমধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে যেমন পদার্থ-বিদ্যা, আবার কোন কোন বিজ্ঞান এখনো শৈশবে রয়েছে। বিজ্ঞান-ঐক্যের এই মতামতকেই বলা হয় সায়েন্টিজম। যৌক্তিক নির্ণয়নবাদের এক শাখা আবার আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন পুরাপুরি যথার্থ হওয়ার জন্য সব বিজ্ঞানকে শেষ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যার (Physics) ভাষায় প্রকাশ লাভে সক্ষম হতে হবে। কারণ তাঁদের মতে পদার্থবিদ্যার ভাষাই একমাত্র বিশ্বভাষা (Universal), এই ভাষাতে রচিত না হলে বা এই ভাষাতে অনূদিত হতে না পারলে কোন বাক্যই পুরাপুরি অর্থপূর্ণ হতে পারবে না। ফিজিকালিজম নামে পরিচিত এই মতবাদ বহু বিতর্কিত হলেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এর প্রভাব সুস্পষ্ট। যেমন উদাহরণস্বরূপ মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে আজকাল ব্যবহারবাদী মনস্তত্ত্ব (behaviourist psychology) প্রাধান্য লাভ করেছে—যেখানে 'অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতা' (inner experience) চেতনা (consciousnes) ইত্যাদির কোন গুরুত্ব নেই যদি না এরা মানুষের বাহ্যিক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত না হয়; এবং এই ব্যবহারের প্রশ্ন উঠলে ধীরে ধীরে এটা পদার্থবিদ্যার আওতায় গড়িয়ে আসে।

আমরা দেখেছি যৌক্তিক নির্ণয়নবাদ খুব কড়াকড়িভাবে বিশ্লেষণ-মূলক দর্শন অর্থাৎ বিভিন্ন বিজ্ঞান কর্তৃক লব্ধ জ্ঞানের বিশ্লেষণ-করার অতিরিক্ত কোন কাজ এটা দর্শনকে দেয় না। এদিক থেকে এটা বৃহত্তর একটা দার্শনিক গোষ্ঠীর অঙ্গ যাকে সাধারণভাবে বিশ্লেষণ-মূলক দর্শন (analytic philosophy) বলা হয়। এর মূল ধারাটি পুরানো ব্রিটিশ পরীক্ষাবাদীদের এতিহ্য বহন করে আধুনিককালের মুর, রাসেল, ভিটগেনস্টাইন প্রমুখের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে আমরা রাসেল ও ভিটগেনস্টাইনের দর্শনের কয়েকটা দিক খুবই সংক্ষেপে। আলোচনা করতে পারি

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দর্শনের বহুমুখী ও বহুবার পরিবর্তিত দর্শনের মূল লক্ষ্যটি খুঁজতে হলে তাঁর (Logic and Mysticism) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত একটি ঘোষণা উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি বলেছেন, দার্শনিকের কাজ হলো বিজ্ঞানে ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়া। কিন্তু বহু দার্শনিক এ কাজে ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবনকে বোঝার চেষ্টা দূরে থাক তাঁরা একে মায়া আখ্যা দিয়ে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত তাঁদের গড়া এক জগতের পেছনে ধাওয়া করেছেন। তাঁর নিজের দর্শনে রাসেল সব সময় এই দোষ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। খাঁটি পরীক্ষাবাদীর মত তিনি বিশ্বাস করতেন আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের উৎস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। এই প্রাথমিক তথ্যগুলোকে রাসেল বললেন ইন্দ্রিয় তথ্য (sense data)। এই শব্দটি পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রিয় তথ্য থেকে কিভাবে বিশ্ব-ছবি গড়ে উঠে সেই ব্যাপারে অন্যদের সাথে তাঁর অনেকক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল। তাঁর নিজের মতামতও তাঁর দীর্ঘ দার্শনিক জীবনে কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে। দর্শনে রাসেলের সব চেয়ে বড় অবদান বোধ হয় গণিতের সাথে একত্রীকরণের মাধ্যমে যুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন যার ফসল প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা, এ শতাব্দীর দর্শনে যার বহুমুখী প্রভাব রয়েছে। এ সম্বন্ধে আগেও উল্লেখ করা হয়েছে।

যে বিশেষ দার্শনিক মতবাদের আবিষ্কর্তা হিসেবে রাসেলকে ধরা হয় তা হল যৌক্তিক পরমাণুবাদ (logical atomism) তাঁর ছাত্র ভিটগেনস্টাইন সহ তিনি এ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই দার্শনিক মত প্রকাশ করেন। এতে প্রত্যেকটি বাক্য বা প্রস্তাবনাকে আলাদা আলাদা অংশে ভাগ করে ফেলা হয়। এই অংশগুলোর বেশীর ভাগ হবে নানান জিনিসের নাম। জিনিসগুলো দু'রকমের হতে পারে, কোন বিশেষ জিনিস যেমন কোন বস্তু বা ব্যক্তি অথবা সাধারণ জিনিস যেমন গুণ, সম্পর্ক ইত্যাদি। এ সব অংশ যেন ছোট ছোট যৌক্তিক কণিকা যার থেকে সব প্রস্তাবনা ও বিশ্বছবি গড়ে উঠছে।

রাসেল ও ভিটগেনস্টাইনের মতে এ রকম কিছু কণিকার আর কোন বিশ্লেষণ অসম্ভব। ফলে তাদেরকে যৌক্তিক পরমাণু (logical atom) বলা যেতে পারে। এই পরামাণুগুলোকে আলাদা করা যায় এবং বিশ্বছবি লাভ করতে হলে এই যৌক্তিক পরমাণুগুলোকে বুঝতে হবে। এভাবে যৌক্তিক বিশ্লেষণ দর্শনের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করে তাতে বাক্য মাত্রই যৌক্তিক পরমাণুর সমষ্টি—এতে পরামাণুগুলোকে যৌক্তিক উপায়ে বাক্যে সন্নিবেশিত করা হয়—আর সেই যুক্তি প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকায় বর্ণিত নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। এ নিয়মের বাইরেও আমরা নানা বাক্য উচ্চারণ করি, তবে সেগুলো অর্থহীন।

রাসেল যৌক্তিক পরমাণুবাদকে শেষ পর্যন্ত মোটের উপর সঠিক মনে করে গেলেও ভিটগেনস্টাইন তা করেননি। জীবনের শেষের দিকে ভিটগেনস্টাইন এই ব্যাপারে তাঁর মতামত সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলেছিলেন। ভাষা সম্বন্ধে তাঁর আগের মতামত বদলে ভিটগেনস্টাইন বললেন, আদর্শ ভাষা, যৌক্তিক ভাষা বলতে কিছু নেই, ওটা কল্পনার সৃষ্টি মাত্র। ব্যবহৃত ভাষার স্বরূপ মানুষের চিন্তার তথা তার জীবনের স্বরূপের অনুরূপ। কাজেই দৈনন্দিন ব্যবহৃত আটপৌরে ভাষার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ হওয়া উচিত। ভাষার বিশ্লেষণের উপর এরকম জোর দেয়াটা আজকাল বিশ্লেষণমূলক দর্শনে এতই প্রাধান্য লাভ করছে যে, এই পুরো দর্শনটাকেই অনেক সময় ভাষামূলক দর্শন (linguistic philosophy) বলে অভিহিত করা হয়।

আধুনিক দর্শনের আলোচনায় আমরা এ পর্যন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মতবাদকে বাদ দিয়ে গিয়েছি, তা হল মার্ক্সীয় দর্শন। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এটা দর্শনের প্রকৃতি ও ভূমিকা সম্বন্ধে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সৃষ্টি করছিল। স্বল্প পরিসরে এর আলোচনা করা কঠিন, কারণ মার্ক্সীয় দর্শনকে সার্বিক মার্ক্সবাদ থেকে, এর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক মতবাদগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করা

প্রায় অসম্ভব। এইজন্যই মার্ক্সীয় দর্শনের আলোচনার আগে সমসাময়িক ও পরবর্তী অন্যান্য মতবাদের মাধ্যমে দর্শনের মূল প্রশ্নগুলো আলাদা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মার্ক্সবাদের বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা না করে আমরা শুধু আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—বিজ্ঞানোত্তর চিন্তার অবসানে এর ভূমিকাটি দেখব এবং আধুনিক অন্যান্য দর্শনের সাথে এর প্রধান পার্থক্যগুলো আলোচনা করব।

বিজ্ঞানোত্তর চিন্তা সম্বন্ধে মার্ক্সীয় দর্শনের বক্তব্য এঙ্গেলসের একটি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হতে পারে :

'যেই মাত্র আলাদা আলাদা বিজ্ঞানগুলো যাবতীয় জিনিস ও এদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের মোটফলের মধ্যে নিজ নিজ জায়গা পরিষ্কার করে নেয়, তখন সেই মোটফল নিয়ে আবার আরেকটা বিশেষ বিজ্ঞানের সৃষ্টি নেহাত বেদরকারী। আগেকার সমস্ত দর্শনের মধ্যে যেটুকু তবু স্বাধীনভাবে টিকে থাকে, তা হল চিন্তার বিজ্ঞান আর তার নিয়মকানুন—চলতি যুক্তিবিদ্যা (formal logic) ও ডায়ালেকটিক। আর সবকিছু প্রকৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কীয় নির্ণয়নবাদী (positive) বিজ্ঞানের সাথে মিশে যায়।'

এর সাথে যৌক্তিক নির্ণয়নবাদীদের মূল বক্তব্যের তফাত কোথায়? খুঁটিনাটিতে মার্ক্সবাদ ও নির্ণয়নবাদের যত বিবাদই থাক, একটি মূল বিষয়ে গোড়া থেকে এরা একমত, তা হলো বিজ্ঞানোত্তর চিন্তাকে দর্শন বলে চালানো যায় না। পুরো চিন্তারাজ্যকে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুনিষ্ঠ করাই মার্ক্সীয় দর্শনের লক্ষ্য—যাতে শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ঘটনার বিবর্তন সব কিছুই কড়াকড়িভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়মের আওতায় আসবে। এদিক থেকে মার্ক্সীয় দর্শন আধুনিক দর্শনের মূল সুরের একটি প্রধান সুর।

বলশেভিক বিপ্লবের প্রাক্কালে বগদানভ প্রমুখ কয়েকজন নামকরা বলশেভিক আর্নস্ট মাখের নির্ণয়নবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর মতবাদকে মার্ক্সবাদের সহায়ক মনে করতেন।

লেনিন অবশ্য এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং 'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতা-সমালোচনা' (Materialism and Empiriocriticism) নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে বস্তু সম্বন্ধে মাখের অভিজ্ঞতাবাদী মতামত অস্বীকার করেন। খাঁটি বস্তুবাদী হিসেবে লেনিন বস্তুকে পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতার উপর কোন প্রকারে নির্ভরশীল হতে দিতে পারেন না। তাঁর মতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বস্তুর যে কোন স্বরূপই আবিষ্কৃত হোক না কেন, অভিজ্ঞতার বাইরে এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে তার একটা নিজস্ব অস্তিত্ব থাকতে হবে। কিছু কিছু নির্ণয়নবাদী আবার এ ধরনের কড়া বস্তুবাদের সমালোচনা করে বলেন, এতে করে অভিজ্ঞতার বাইরে, পরীক্ষার অতীত এক ধরণের অন্তর্নিহিত 'বস্তু' আমদানী করে কার্যত বিজ্ঞানোত্তর চিন্তাকেই প্রশ্রয় দেয়া হয়। এভাবে মার্ক্সীয় ও নির্ণয়নবাদী দর্শনের মধ্যে একটা বড় বিরোধ হচ্ছে বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে।

দর্শনের বৈজ্ঞানিক পটভূমি সম্বন্ধে আধুনিক অন্যান্য দর্শনের দিকদর্শক হয়েও মার্ক্সীয় দর্শন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এদের চেয়ে ভিন্ন। একটি পার্থক্য হল মার্ক্সবাদ দর্শনের সক্রিয় ভূমিকাতে বিশ্বাস করে। মার্ক্সের একটি বিখ্যাত উক্তি হল, 'এ পর্যন্ত দার্শনিকরা জগৎকে নানাভাবে শুধু ব্যাখ্যা করারই চেষ্টা করেছেন, আসল কাজ হওয়া উচিত জগতের পরিবর্তন করা।' মার্ক্সের দর্শন শুধু বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যায় শেষ হয়ে যায় না, জগতের পরিবর্তনে তার সক্রিয় ভূমিকা থাকতে হয়। এই কারণেই অন্যান্য প্রধান দর্শনের তুলনায় এটা এত তাড়াতাড়ি ও এত প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনে, জীবিকায় ও চিন্তাধারায় এতখানি পরিবর্তন আনতে পেরেছে। আরেকটি প্রধান পার্থক্য হলো মার্ক্সীয় দর্শন চলতি এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে না করে জার্মান দার্শনিক হেগেলের দৃষ্টান্ত অনুসরণে ডায়ালেকটিক যুক্তিকেও চিন্তা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছে। জগতে সব কিছু পরিবর্তনশীল ও সব সময় পরিবর্তনের অবস্থায় রয়েছে, এই কারণে চলতি যুক্তিবিদ্যার অপরিবর্তনীয় নিয়মগুলো (যেমন—'ক' যদি 'খ' এর সমান হয়, তা হলে

কখনো এটা 'খ' এর অসমান হতে পারে না) সব সময় খাটে না। পরিবর্তনশীল জিনিসকে বুঝতে হলে বক্তব্য ও তার বিরুদ্ধে প্রতি-বক্তব্যের দ্বন্দ্বের ফলে উদ্ভূত সংশ্লেষণ ক্রিয়াকে গুরুত্ব দিতে হবে। এরই নাম ডায়ালেকটিক বা দ্বন্দ্বমূলক যুক্তি। চলতি যুক্তিবিদ্যাকে বড় জোর বৃহত্তর ডায়ালেকটিক যুক্তিবিদ্যার একটি বিশেষ রূপ বলে নেয়া যেতে পারে যেটা শুধু তখনই প্রজ্যো হবে যখন পরিবর্তনের গতি খুব ধীর ও গুরুত্বহীন হবে। আমাদের সাধারণ জীবনের ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনেক কিছুই এরকম বলে এসব ব্যাপারে চলতি যুক্তিবিদ্যার ব্যবহার মার্ক্সীয় দর্শনের পরিপন্থী নয়। হেগেল যদিও তাঁর ভাববাদী দর্শনের অস্ত্র হিসেবে ডায়ালেকটিক যুক্তির ব্যবহার করেছিলেন, মার্ক্সবাদ করেছে ঠিক তার উল্টোটি। ডায়ালেকটিক যুক্তির মাধ্যমে বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেছে বলে মার্ক্সীয় দর্শন ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) নামে পরিচিত।

সাধারণভাবে বিশ্লেষণধর্মী দর্শন ও মার্ক্সীয় দর্শনকে বাদ দিলে আজকের দুনিয়ায় আর যে প্রধান দার্শনিক মতবাদ থাকে তা হলো অস্তিত্ববাদী দর্শন (Existentialism)। ফরাসী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের নামের সাথে অস্তিত্ববাদের যে প্রধান পার্থক্য তা হলো এতে মানুষের অস্তিত্বকে ও তার ব্যাখ্যাকে দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয় করে তোলা হয়েছে। এ যেন বিশ্ব দর্শনের নাটকে মানুষকে দর্শকের ভূমিকা দেয়া। অস্তিত্ববাদ সাম্প্রতিককালে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। বিশেষ করে নাৎসী দখলদারদের অধীনে কিছু ফরাসী দার্শনিকদের তীব্র অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান অস্তিত্ববাদ দানা বেঁধে উঠেছিল। সার্ত্রের দর্শনের মাধ্যমে এটা অনেক ক্ষেত্রে মার্ক্স-বাদের কাছাকাছি চলে এসেছে। সার্ত্রের সর্বাধুনিক বইয়ে মার্ক্সীয় দর্শনকে এ যুগের কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে এর যৌক্তিকতার মধ্যে কিছু রদবদল কামনা করা হয়েছে। অস্তিত্বকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা দেয়ার ফলে যৌক্তিক নির্ণয়নবাদের সঙ্কীর্ণতর পরিকল্পনার

সাথে অস্তিত্ববাদের তফাত রয়েছে প্রচুর। কিন্তু এখানেও বিজ্ঞানোত্তর চিন্তার কোন দার্শনিক ভূমিকা নেই।

আধুনিক দর্শনের যে অতি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা বর্তমান প্রবন্ধে করা হল তাতে একটা জিনিস সুস্পষ্ট,—আজকের প্রায় সবগুলো প্রধান দর্শন থেকে ভাববাদ, বিজ্ঞানোত্তর চিন্তা ও অতীন্দ্রিয়বাদ চূড়ান্তভাবে নির্বাসিত। দর্শনের এটিই আজ মূল সুর। এই সুর রচিত হয়েছে দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গত কয়েক শতাব্দীর পরস্পর-প্রভাবিত অগ্রগতির মাধ্যমে। অনেকের কাছে দর্শন মাত্রই বিজ্ঞানের দর্শন। বাকীরা যারা অতটুকু যেতে চান না, তাঁদের কাছে এটা বিজ্ঞানের পটভূমিতে রচিত দর্শন। পাশ্চাত্য দর্শন আখ্যা দিয়ে আমাদের চিন্তা-ব্যবস্থায় একে অবহেলা করার উপায় নেই। যেই অর্থে আজকের দুনিয়ায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বা গণিত নেই, আছে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান বা গণিত, সেই অর্থে পাশ্চাত্য দর্শন বলেও কোন জিনিস নেই। বিশ্বদর্শন আঞ্চলিক হতে পারে না।

:১৭৩

বিজ্ঞানে বিশ্বাস করা কেন অথবা দর্শনে আরোহ সমস্যা

টেলিভিশনে চাঁদে নামার ছবি দেখে আর ক্ষেপণাস্ত্রের খাঁড়ার তলে বাস করে বিজ্ঞানে বিশ্বাসের প্রশ্নটি নূতন করে তুলতে রাগ হওয়ার কথা। তবে এই মুহূর্তে দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একে দেখতে চাই, যাঁরা দেকার্তের সেই পরামর্শের কথা কখনো ভোলেন না—যতক্ষণ যৌক্তিকভাবে পার সন্দেহ করে যাও। অন্য দশজন হেতুবাদী মানুষের মত দার্শনিকও সাধারণভাবে বিজ্ঞানে বিশ্বাস করেন (না করে উপায় কি?)। কিন্তু এর সম্পর্কে একটি দার্শনিক প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য তারা বহুদিন ধরে ছটফট করছেন। এর মীমাংসা না হলে শুধু বিজ্ঞান নয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিশ্বাসের পেছনে যুক্তির সমর্থন দেখানো যায় না। সেটি নিশ্চয়ই খুব আরামপ্রদ অবস্থা নয়।

যে কেউ একজনকে ধরে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সে বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে কেন, খুব সম্ভব উত্তর আসবে—বিজ্ঞানে কাজ হয় বলে। পরিষ্কার দেখেছি বিজ্ঞানের কথামত পাখা ঘুরে, রোগ সারে, বোমা ফাটে। অবিশ্বাস করে মারা পড়ব নাকি? এ হল সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা। এতে কিন্তু একটা ফাঁক থেকে যায়। বুঝলাম এ পর্যন্ত কাজ করেছে, কিন্তু আগামীতে যে কাজ করবে তার নিশ্চয়তা কি? খুব সম্ভব দুটা মনোভাব কাজ করেছে এই নিশ্চয়তাবোধের পেছনে।

প্রথমত বিজ্ঞানের যুক্তি পদ্ধতি এতই অভ্রান্ত যে সে ভুল বলতে পারেনা; দ্বিতীয়ত নিজের চোখেই এত বছর ধরে অসংখ্যবার দেখে এলাম এটা কাজ করে, ভবিষ্যতেও না করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এই উভয় মানাভাবের জন্ম দিয়েছে আসলে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে

বিশ্বাস—দর্শনের ভাষায় যাকে বলা হয় আরোহ (Induction)। যদিও সাধারণভাবে দেখতে গেলে এ পদ্ধতির মধ্যে অসঙ্গত কিছুই দেখা যায় না, তবুও এর যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে গিয়ে দার্শনিকদের বহুদিন ধরে হিমসিম খেতে হয়েছে। এখনো অনেকে খাচ্ছেন। এই আরোহ সমস্যাকে (Problem of Induction) বুঝতে হলে ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হবে।

যুক্তিবিদ্যার যে পদ্ধতি স্বতঃলব্ধ (apriori), স্পষ্টত সত্য, তা হলো অবরোহী যুক্তি (Deductive Logic)। 'মানুষ মরণশীল' এই যুক্তিবাক্য স্বীকার করে নেয়া হলে, আমি মানুষ এই শর্ত সাপেক্ষে আমিও মরণশীল। এটি একটি আবশ্যকীয় সত্য, কারণ এতে নূতন কোন তথ্য সংযোজিত হয়নি। যুক্তিবাক্য ও শর্ত ঠিক থাকলে সিদ্ধান্ত ঠিক হতে বাধ্য। গণিতে ও বিজ্ঞানে এ ধরনের অবরোহী যুক্তি প্রচুর ব্যবহার করা হলেও তা করতে হয় জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও পুনর্বিন্যাসের জন্য। এটি বিজ্ঞানের প্রধান কাজ নয়। বিজ্ঞানের প্রধান কাজ নূতন জ্ঞানের আহরণ, তার মধ্যে নিয়মের আবিষ্কার। যেমন উপরের উদাহরণে বিজ্ঞানের আসল কাজ 'মানুষ মরণশীল' এটা প্রতিষ্ঠিত করা। স্বভাবতই রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রমুখ অনেকেরই পরীক্ষিত ও পর্যবেক্ষিত নিশ্চিত মরণশীলতার উপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞান এ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। অর্থাৎ এখানে কিছু মানুষের মরণশীলতা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার উপর 'আরোহণ' করে বিশ্বের যাবতীয় মানুষের মরণশীলতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এটাই আরোহী পদ্ধতি।

বিজ্ঞান মূলত আরোহী পদ্ধতি আশ্রয়ী। যাবতীয় বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও নীতি এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম শুদ্ধ চিন্তা বা যুক্তি তর্কের বলে লাভ করা যায়নি। এটা আপেলের পতন, ঢিল বা কামানের গোলার গমনরীতি, গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি ইত্যাদি বহু জিনিস বহু দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে তার ভিত্তিতে যাবতীয় ভরযুক্ত বস্তু সম্পর্কে একটা সঙ্গত নিয়ম; আ ী পদ্ধতিতে

যা প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিক নিয়মের মত এর ভিত্তিতে নেয়া সব জটিল ভবিষ্যদ্বাণী যুগ যুগ ধরে সত্য হতে দেখা গেছে। কাজেই আরোহী পদ্ধতির উপর ভক্তি জন্মানো স্বাভাবিক। শুধু বিজ্ঞানে নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এই ভক্তিই আমাদের নানা কাজে ও বিশ্বাসে প্রবুদ্ধ করে; এবং বলা বাহুল্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এতে আমরা ঠকি না। কাল সকালে যে যথারীতি সূর্য উঠবে আমাদের এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে অতীতের দেখা সব সূর্যোদয়। যদি প্রশ্ন করা হয়, আগে সব সময় উঠেছে বলেই কালও সূর্য উঠবে, এমন কথা উঠতে না দেখা পর্যন্ত বলি কেমন করে? তাহলে উত্তর দেব পদার্থবিদ্যায় 'গতির নিয়ম' অনুসারে সূর্য উঠতে বাধ্য। তবে গতির নিয়ম এদ্দিন কাজ করেছে বটে, কিন্তু কাল সকালে যে এটা কাজ করবে এমন কথা কে বল্‌লো? এভাবে আমরা আবার আগের সন্দেহেই ফিরে যাই—পুরানো সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী আমরা করতে পারি কিনা।

একটু ভাবলেই দেখা যাবে আর যাই হোক এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারার স্বতঃসিদ্ধে কোন আবশ্যকতা নেই, যেই অর্থে অবরোহী যুক্তির আছে। সব কমলা গোলাকার হলে এই কমলাও গোলাকার —এই সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা অমোঘ আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এই কমলা, ঐ কমলা, সেই কমলা ইত্যাদি গোলাকার; কাজেই কমলা মাত্রই গোলাকার —এই সিদ্ধান্ত সঠিক হবার সঙ্গত সম্ভাবনাই শুধু আছে, অমোঘ আবশ্যকতা নয়। যত সংখ্যক পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন এভাবে নেয়া সিদ্ধান্ত ভুল হতে দেখলে বলবার কিছু থাকে না। যুগ যুগ ধরে যত সাদা রাজহাঁস দেখা যাক কেন 'রাজহাঁস সাদা' এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের একটি মাত্র কালো রাজহাঁস ভণ্ডুল করে দিতে পারে।

কাজেই যুক্তিবিদ্যায় অবরোহী ও আরোহী উভয় পদ্ধতিকে স্থান দেয়া হলেও আরোহী পদ্ধতির যৌক্তিকতা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে স্পষ্ট

নয়। অথচ এর যৌক্তিকতা যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি বিজ্ঞানে এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে বিশ্বাসের হেতুও দুর্বল হয়ে পড়ে। কাল ভোরে সূর্য উঠতে দেখার আশা করার বা এক গ্লাস দুধ হাতে নিয়ে তাকে এক গ্লাস পানির চেয়ে বেশী পুষ্টিকর মনে করার বিশেষ কোন কারণ থাকে না। এটাই দর্শনে 'আরোহ সমস্যা'।

সমস্যাটা সম্বন্ধে প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম। তিনি লিখেছেন, 'তুমি বলছ একটা ঘটনা দেখে আরেকটা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া চলে। কিন্তু তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এই সিদ্ধান্ত সজ্ঞেয় (intutive) নয়, স্পষ্টত প্রদর্শনক্ষমও (demonstrative) নয়। তবে এটা কোন প্রকৃতির?' সীমিতসংখ্যক ঘটনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সর্বব্যাপী সত্যে কি ভাবে পৌঁছানো যায় তাই হিউমকে ভাবিয়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালের দর্শন, এমনকি আজ পর্যন্ত, এই সংশয়বাদ পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

সমস্যাটি বিরক্তিকর বলে এটাকে এড়াবার নানা চেষ্টা রয়েছে। এর মধ্যে কতগুলো স্পষ্টত সন্তোষজনক নয়। যেমন বলা হয় অতীতেও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং বরাবর তা ঠিক হতেও দেখা গেছে, কাজেই ভবিষ্যদ্বাণীর এই পদ্ধতির উপর সন্দেহ করা কেন? কিন্তু এতে মূল সমস্যাটি থেকে যাচ্ছে। ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়েছে 'অতীত ভবিষ্যতের' ক্ষেত্রে। তার ভিত্তিতে 'ভবিষ্যত ভবিষ্যতে' এটা ঠিক হবে বলতে গেলে আরোহী পদ্ধতির সাহায্য দরকার। তাই আরোহ সমস্যা থেকে যায়।

আবার যদি বলা হয় বিশ্বে সব কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন—বার বার একই জিনিস ঘটতে দেখা গেলে হঠাৎ এক সময় বিনা কারণে তার অন্যথা হবে এটা প্রকৃতির নীতিবিরুদ্ধ। প্রশ্ন উঠবে এই নীতিটি এলো কোত্থেকে? নিশ্চয়ই এটা দৈবলব্ধ বা অধিবিদ্যক (metaphysical) নয়। কাণ্ট একে স্বতঃলব্ধ (a priori) হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করলেও পরে তা ধোপে টেকেনি। তাহলে অবশ্যই নীতিটা

১২৯

অতীত অভিজ্ঞতা প্রসূত। অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে এই নীতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হলে আবার 'আরোহ সমস্যা' এসে যায়। কাজেই এত সহজে এর কাছ থেকে নিস্তার মিলছে না।

আরোহী পদ্ধতির সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবহার বোধ হয় একে নিশ্চয়তার পথ হিসেবে না নিয়ে সম্ভাব্যতার (probability) পথ হিসেবে নেয়া। 'দুটো জিনিস সব সময় এক সাথে দেখা গেছে'—এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীবার 'এদের নিশ্চিত এক সাথে দেখা যাবে' মনে করার চেয়ে 'এদের এক সাথে দেখা যাবার সঙ্গত সম্ভাবনা আছে মনে করাই অধিকতর নিরাপদ। বার্ট্রাণ্ড রাসেল এ সম্পর্কে একট করুণ উপমা দিয়েছেন। জন্মলগ্ন থেকে যেই লোকের আসার সাথে খাবার পাওয়ার সম্পর্ক মুরগী অসংখ্যবার দেখে এসেছে, সেই লোকই একদিন আসে মুরগীকে জবাই করতে, খাবার দিতে নয়। এ ক্ষেত্রে আরোহী পদ্ধতির নিশ্চয়তা দান ক্ষমতায় সন্দেহবান হলেই মুরগী ভাল করত।

শুধু সম্ভাব্যতা প্রদান যদি লক্ষ্য হয় তবে আরোহ সমস্যা হয়ে পড়ে সীমিতসংখ্যক দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে, ক সবসময় খ এর সাথে ঘটে—এ ধরনের প্রস্তাবনার সম্ভাব্যতা যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। শুধু তাই নয়, দেখাতে হবে যে দৃষ্টান্তের সংখ্যা যত বেশী হবে এই সম্ভাব্যতা তত বেড়ে যাবে এবং যথেষ্ট সংখ্যক দৃষ্টান্ত একে প্রায় নিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাবে। একটি মাত্র কালো রাজহাঁসের আবিষ্কার তখন রাজহাঁসের সাদাত্ব সম্বন্ধে আরোহী সিদ্ধান্তকে ভণ্ডুল করতে পারবে না। কারণ সে সিদ্ধান্তে বলা হবে, 'অভিজ্ঞতার আলোকে মনে হয় সব রাজহাঁস সাদা হওয়ার সঙ্গত সম্ভাব্যতা আছে।' পরে কালো রাজহাঁস আবিষ্কার হলেও এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয় না। নিশ্চয়তার দাবী না করায় এই একট সুবিধা হল যে যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করা যাক বা না যাক,

এ রকম আরোহী পদ্ধতিকে যৌক্তিকভাবে অন্তত অপ্রমাণ (disprove) করা যায় না।

কিন্তু প্রমাণ করার প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে দেখতে হবে সম্ভাব্যতা বলতে কি বোঝায়। নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। জে. এম. কেইন্‌স তাঁর Treatise on Probability গ্রন্থে এ সম্পর্কে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মতের প্রবক্তা। তাঁর মতে কোন প্রস্তাবনার সম্ভাব্যতা নির্দেশ করার মানেই হল কিছু জ্ঞানের সাথে প্রস্তাবনাটির সম্পর্ক স্থাপন। কি ধরণের সম্পর্ক? কেইন্‌সের উত্তর হল: যৌক্তিক সম্পর্ক। তিনি সম্ভাব্যতা নির্ণয়কে এক আলাদা ধরনের যুক্তি পদ্ধতি হিসেবে নিয়েছেন। প্রমাণিত পূর্বজ্ঞানের সংখ্যা, স্বরূপ ইত্যাদির মধ্যেই নিহিত থাকবে এর যথার্থতা। ভবিষ্যতের কোন পরীক্ষার ফলাফলের উপর এই সম্ভাব্যতা নির্ণয় করবে না। এভাবে প্রতিষ্ঠিত-সিদ্ধান্তের সঠিকতা স্বতঃলব্ধ (a priori) যুক্তিবাক্যে নিহিত; যেমনটি হয় অবরোহী যুক্তির ক্ষেত্রে। কেইন্‌সের মতে অধিকসংখ্যক দৃষ্টান্ত অধিক সম্ভাব্যতা দেয়ার কারণ হল দৃষ্টান্তের সংখ্যা বেশী হলে তাদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বস্তুগুলো ছাড়া অন্যান্য জিনিসও সাধারণভাবে উপস্থিত থাকার (having in common) সম্ভাবনা কমে যায়। যেমন ক ও খ এক সাথে দেখা যাওয়ার সম্ভাব্যতা নিয়েই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে দৃষ্টান্তসমূহে তৃতীয় আরেকটা জিনিস গ সাধারণভাবে উপস্থিত থাকলে এই সম্ভাব্যতা অপেক্ষাকৃত কম হয়। কারণ এমনো তো হতে পারে যে খ আসলে গ এর সাথে সম্পর্কিত, ক এর সাথে নয়। দৃষ্টান্তের সংখ্যা যত বেশী ও বিচিত্র হয় ততই গ ইত্যাদি অপ্রাসঙ্গিক জিনিস এদের মধ্যে সাধারণভাবে থাকার সম্ভাবনা কমে যায়।

উপরোক্ত মতের একটা অসুবিধা হচ্ছে এটা অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ। নূতন অভিজ্ঞতার আলোকে এটা পূর্ব যুক্তিবাক্য আশ্রয়ী সম্ভাব্যতায় কোন রকম রদবদল করতে পারে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা বলতে আমরা যা বুঝি তা নূতন অভিজ্ঞতার সাথে বদলায়। শেষোক্ত প্রয়োজনের

সাথে সঙ্গতিপন্ন আরেকটা ব্যাখ্যা সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে চালু আছে—যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অহরহ ব্যবহৃত হচ্ছে। এর নাম সম্ভাব্যতার 'ফ্রিকোয়েন্সি থিওরী'। এই সংজ্ঞা মতে ক গুণ সম্পন্ন বস্তুর খ গুণ থাকার সম্ভাব্যতা হল ক গুণ সম্পন্ন মোট বস্তুর কত ভগ্নাংশের মধ্যে খ গুণ আছে তা। যে সমাজে মানুষ একটাই বিয়ে করে সেখানে একজন বিবাহিত মানুষের পুরুষ হওয়ার সম্ভাব্যতা অর্ধেক। যদিও বিজ্ঞানের তরফ থেকে সম্ভাব্যতার এই ব্যাখ্যা অধিকতর গ্রাহ্য, দার্শনিক দিক থেকে এটাও দোষমুক্ত নয়। আমরা অবশ্য আপাতত সে তর্কে যাব না।

সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে আরোহী পদ্ধতির যৌক্তিকতা দেখাতে উৎসাহ যুগিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান নিজে। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে সম্ভাব্যতার ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। সমাজ বিজ্ঞান এখন প্রধানত সম্ভাব্যতা আশ্রয়ী। সব সত্ত্বেও কিন্তু সম্ভাব্যতার সুবিধামত সংজ্ঞা দিয়ে আরোহ সমস্যার সমাধানে একটা মৌলিক আপত্তি আছে। স্বতঃলব্ধ গাণিতিক সম্ভাব্যতার হিসাব (probablity calculas) বাইরের বাস্তব ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীতে আদৌ যৌক্তিকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে কি? আরোহ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা তাই আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রবাহিত হয়েছে। এর প্রবক্তা হলেন কার্ল পপার।

পপার বল্লেন, আরোহী পদ্ধতিকে যৌক্তিক প্রমাণ করার জন্য এই যে আকুলি-বিকুলি তার কারণ কি? বিজ্ঞানের পদ্ধতির পেছনে সমর্থন যোগানো তো! কিন্তু বিজ্ঞান নিজেই তো এই আরোহী পদ্ধতির ধার ধারে না! আসলে আরোহ জিনিসটাই একটা রূপকথা—আদৌ কোন কাজে আসে না। তাঁর মতে বিজ্ঞানের বক্তব্য বহু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আরোহী পদ্ধতিতে সৃষ্ট নয়। কোন একটা বিষয়ে বিজ্ঞান এমনিতেই চট্ করে একটা ধারণা নিয়ে বসে, অনেক সময় শুধু একটিমাত্র পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের পরেই। এই ধারণাকে তক্ষুনি সে 'নিয়ম' বলে না। সে মুহূর্তে বিশেষ কোন যোক্তিকতা তার নাও থাকতে পারে। একে বলা হয় একটা 'অনুমান' (hypothesis) বা একটা তাত্ত্বিক ব্যবস্থা

(theoretical system)। এই অনুমান থেকে অবরোহী যুক্তির (deductive logic) মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত টানা হয়। এসব সিদ্ধান্তকে একে অপরের সথে এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তের সাথে মিলিয়ে নেয়া হয় তাদের মধ্যে যৌক্তিক সামঞ্জস্য আছে কিনা দেখার জন্য। তারপর বাস্তব ক্ষেত্রে এদের নানা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সম্মুখীন করা হয়। এই সবকিছুতে টিকলে তবেই মূল অনুমানকে আপাতত সত্য বলে ধরে নেয়া যায়। যে কোন সময় এর কোন একটি সিদ্ধান্ত পরীক্ষায় ভুল প্রমাণিত হলে সাথে সাথে মূল অনুমানটাই ধ্বসে পড়ে। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত একে বৈজ্ঞানিক নিয়ম হিসেবে গ্রহণ ও ব্যবহার করা চলে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরোক্ত বর্ণনা যদি ঠিক হয় তাহলে এর মধ্যে আরোহের কোন স্থান নেই। এতে যা আছে তা হল শুদ্ধ অবরোহী যুক্তি—যার মধ্যে কোন 'সমস্যা' নেই।

এই বর্ণনা সম্বন্ধে অবশ্য সাথে সাথেই কিছু প্রশ্ন উঠে। পপার নিজেই এর অনেকগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। একটা প্রশ্ন হতে পারে আরোহের কোন সহায়তা ছাড়া পর্যবেক্ষণ থেকে চট্ করে একটা অনুমানে চলে যাই কেমন করে? এর উত্তরে বলা হয়েছে—ঠিক পর্যবেক্ষণ থেকে তো অনুমানে যাই না, যাই একটা সমস্যা-অবস্থা (problem situation) থেকে, যা পর্যবেক্ষণটার কারণ ঘটিয়েছে। অনুমানটা সেই সমস্যা-অবস্থার একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসেবেই খাড়া করা হয়। প্রশ্ন থাকে, বহু ব্যাখ্যাই তো হতে পারে, আমরা চট্ করে ভালো অনুমানে চলে যাই কেমন করে? উত্তর, ভালো অনুমানে যেতে হবে এমন তো কথা নেই, যেতে হবে যে কোন অনুমানে। তারপর পূর্বোক্ত পদ্ধতি খাটিয়ে যাচাই করলে অনুমান ভাল না খারাপ বোঝা যাবে। খারাপ হলে আরেকটা অনুমানে ফিরে আসতে হবে। এভাবে চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্তমান সাক্ষ্য-সাপেক্ষে সত্য বলে বিবেচিত হবার মত অনুমান পাওয়া যায়।

একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পপারের সমাধান বিশেষ অসুবিধায় পড়ে। যদি ধরেও নিই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর মত নির্ভুল, তবুও

কি শেষ পর্যন্ত আরোহী পদ্ধতিকে এড়ানো যাচ্ছে? এই যে তিনি পরীক্ষায় ব্যর্থ অনুমানকে নাকচ করে দিচ্ছেন সেটা কোন যুক্তি বলে? একবার ব্যর্থ হয়েছে বলে ভবিষ্যতেও এটা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা—এই বিশ্বাসই কি এখানে কাজ করছে না? এটা কি আরোহ-জাত বিশ্বাস নয়? এমনো তো হতে পারত যে একবার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে বলে ভবিষ্যতে তার ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় (যেমনটি হয়ে থাকে 'হাম' প্রভৃতি রোগ সংক্রমণের ক্ষেত্রে)। কিন্তু না, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আরোহী পদ্ধতিতেই আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে পরীক্ষায় ব্যর্থ অনুমানকে আর বিশ্বাস করতে নেই।

এই ব্যাপারে পপারের উত্তর খুব সন্তোষজনক নয়। তাঁর মতে পরীক্ষায় ব্যর্থ অনুমানকে আমরা বাদ দিই, কারণ, আমরা সত্যের সন্ধান করছি; এও আমরা জানি বা বিশ্বাস করি যে পরীক্ষায় ব্যর্থ তত্ত্ব ভুল: আর যেটা এখনো ব্যর্থ হয়নি তার নির্ভুল হওয়ার অন্তত একটা সম্ভাবনা আছে'। অতএব শেষোক্তটাকে গ্রহণ করা। কিন্তু এই জানা বা বিশ্বাস করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত সেটাই আসল সমস্যা।

উনবিংশ শতাব্দীতে এই আরোহ সমস্যা মার্ক্সীয় দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা এঙ্গেল্‌সকেও ভাবিয়েছে। এঙ্গেল্‌স ডায়ালেকটিক যুক্তি পদ্ধতিতে একে দেখার চেষ্টা করছেন। একমাত্র আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতির সমন্বিত যুক্তির মধ্যেই তিনি আরোহের ভূমিকা দেখতে পান। তিনি বলেন, বিজ্ঞান শুধু আরোহী যুক্তির সৃষ্ট হতে পারে না। এদিক থেকে তাঁর মত কিছুটা পপারের আধুনিকতম মতের কাছাকাছি। এঙ্গেল্‌স আরোহকে দেখেছেন অবরোহের এন্টিথিসিস হিসেবে—নেহাত বৃটিশ পরীক্ষাবাদীদের (empiricist) কল্যাণে একে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন অপরিহার্য বলে মনে হয়। হিউমের সংশয়বাদ তিনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর কাছে একটা জিনিসের পরে আরেকটা ঘটাটাই বড় কথা নয়—দুটা জিনিসের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধটাই বড়, যা সক্রিয় বিজ্ঞানের মারফত স্পষ্ট, সেহেতু সংশয়বাদ তাঁকে ধরে

(theoretical system)। এই অনুমান থেকে অবরোহী যুক্তির (deductive logic) মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত টানা হয়। এসব সিদ্ধান্তকে একে অপরের সথে এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তের সাথে মিলিয়ে নেয়া হয় তাদের মধ্যে যৌক্তিক সামঞ্জস্য আছে কিনা দেখার জন্য। তারপর বাস্তব ক্ষেত্রে এদের নানা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সম্মুখীন করা হয়। এই সবকিছুতে টিকলে তবেই মূল অনুমানকে আপাতত সত্য বলে ধরে নেয়া যায়। যে কোন সময় এর কোন একটি সিদ্ধান্ত পরীক্ষায় ভুল প্রমাণিত হলে সাথে সাথে মূল অনুমানটাই ধ্বসে পড়ে। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত একে বৈজ্ঞানিক নিয়ম হিসেবে গ্রহণ ও ব্যবহার করা চলে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরোক্ত বর্ণনা যদি ঠিক হয় তাহলে এর মধ্যে আরোহের কোন স্থান নেই। এতে যা আছে তা হল শুদ্ধ অবরোহী যুক্তি—যার মধ্যে কোন 'সমস্যা' নেই।

এই বর্ণনা সম্বন্ধে অবশ্য সাথে সাথেই কিছু প্রশ্ন উঠে। পপার নিজেই এর অনেকগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। একটা প্রশ্ন হতে পারে আরোহের কোন সহায়তা ছাড়া পর্যবেক্ষণ থেকে চট্ করে একটা অনুমানে চলে যাই কেমন করে? এর উত্তরে বলা হয়েছে—ঠিক পর্যবেক্ষণ থেকে তো অনুমানে যাই না, যাই একটা সমস্যা-অবস্থা (problem situation) থেকে, যা পর্যবেক্ষণটার কারণ ঘটিয়েছে। অনুমানটা সেই সমস্যা-অবস্থার একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসেবেই খাড়া করা হয়। প্রশ্ন থাকে, বহু ব্যাখ্যাই তো হতে পারে, আমরা চট্ করে ভালো অনুমানে চলে যাই কেমন করে? উত্তর, ভালো অনুমানে যেতে হবে এমন তো কথা নেই, যেতে হবে যে কোন অনুমানে। তারপর পূর্বোক্ত পদ্ধতি খাটিয়ে যাচাই করলে অনুমান ভাল না খারাপ বোঝা যাবে। খারাপ হলে আরেকটা অনুমানে ফিরে আসতে হবে। এভাবে চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্তমান সাক্ষ্য-সাপেক্ষে সত্য বলে বিবেচিত হবার মত অনুমান পাওয়া যায়।

একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পপারের সমাধান বিশেষ অসুবিধায় পড়ে। যদি ধরেও নিই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর মত নির্ভুল, তবুও

নয়। এটা বিজ্ঞানের উপায়। অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিটি তথ্যই ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার একটা হদিশ। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সাধারণ গুণনীয়ক বের করে বিজ্ঞান তাদের মধ্যে 'নিয়ম' আবিষ্কার করে শুধু কাজের সুবিধার জন্য। এদিক থেকে তত্ত্ব, অনুমান বা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অতীত অভিজ্ঞতার মানচিত্র ছাড়া কিছুই নয়।

র‍্যাশনালিটির কোন ধ্রুব প্রমাণ্যতা নেই। বিজ্ঞান র‍্যাশনাল, কারণ এ পর্যন্ত তা কাজ করেছে। বিজ্ঞানের নিজের মধ্যে অনেক এককালীন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বিদায় নিয়েছে এভাবে 'কাজ করতে' গিয়ে। এককালে বিজ্ঞানের মূলে যেই কার্যকারণবাদ (causality) ছিল তা আর নেই। সেই নিরঙ্কুশ নিশ্চয়তার (determinacy) দাবী সে আজ করে না। কাজ করার খাতিরে তাকে রিয়ালিটি (Reality) সম্বন্ধে কথা বলার দাবীও ছেড়ে দিতে হয়েছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিবর্তনশীলতা দিন দিন স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এর সবই র‍্যাশনালিটি বজায় রাখার জন্য।

শেষ পর্যন্ত আমরা সেই কাণ্ডজ্ঞানের কথায় ফিরে যাচ্ছি—কাজ করছে বলেই বিজ্ঞানে বিশ্বাস করছি। কিন্তু এতে লজ্জার কিছু নেই। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকে অবজ্ঞা করাই দর্শনের কাজ নয়। তার কাজ এই সাধারণ জ্ঞান যাচাই করে টিকে কিনা তাই দেখা।

আরোহ সম্বন্ধে সংশয়বাদীদের সংশয় তাই বলে নিরর্থক নয়। শেষ পর্যন্ত তারা জেতে, কিন্তু কাউকে পরাজিত না করে। সত্যিই আরোহের সত্যতার যৌক্তিক প্রমাণ অনুপস্থিত। কিন্তু র‍্যাশনালিটির বিচারে কোন উচ্চতর আদালত না থাকায় আরোহ পদ্ধতি নিজেই নিজের ডিক্রীতে প্রতিষ্ঠিত।

১৯৭৪

———